ভাষা-আন্দোলনের দলিল

ড. আবুল আহসান চৌধুরী

ভাষা-আন্দোলনের দলিল

আবুল আহসান চৌধুরী

কাশবন

ভাষা আন্দোলনের দলিল

ড. আবুল আহসান চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮
দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫
তৃতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭
চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রকাশক
আমিনুল ইসলাম
কাশবন প্রকাশন
২৫৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

অক্ষর বিন্যাস, মুদ্রণ ও বাঁধাই
কাশবন মুদ্রায়ণ
১ ভিতরবাড়ি লেন, নবাবপুর, ঢাকা

প্রচ্ছদ শিল্পী
সমর মজুমদার

প্রাপ্তিস্থান
অনন্যা ও ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা
জাগৃতি : আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা

মূল্য ঃ ১৫০.০০ টাকা মাত্র
ISBN : 984-31-0164-2

www.pathagar.com

উৎসর্গ

বদরুদ্দীন উমর

শ্রদ্ধাভাজনেষু

www.pathagar.com

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।
দেশীভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়াএ
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশে না যাএ।
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি
দেশীভাষা উপদেশ মন হিত অতি।

: আবদুল হাকিম
'নূরনামা' (সতেরো শতক)

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস রচনার মতো এর দলিল সংকলনের মূল্যবান কাজও আরম্ভ করেন বদরুদ্দীন উমর। জনাব উমরের গ্রন্থে সংকলিত হয়নি এমন কয়েকটি দলিল নিয়ে একটি সংকেলন হতে পারে, এই বিষয়ে অধ্যাপক মনসুর মুসার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি আমাকে এই কাজে উৎসাহিত করেন এবং বাঙলাদেশ ভাষা সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। সমিতি আমার প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন। বিশেষ করে ভাষা সমিতির সম্পাদক জনাব মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ্‌র আন্তরিক আগ্রহ ও প্রেরণার ফলেই এই বই প্রকাশিত হতে পারলো। এ-প্রসঙ্গে ভাষা সমিতির সভাপতি ড. আহমদ শরীফ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক আহমদ কবির ও অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের কাছেও আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

এই বইয়ে সংকলিত 'হরফ সমস্যা' পুস্তিকাটি সংগ্রহ করি প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ড. কাজী মোতাহার হোসেনের নিকট থেকে। নূরুল আমীনের ভাষণ-পত্রটি পেয়েছি প্রবীণ সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীর অন্তর্গত চাঁদপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনাব মাহ্‌তাবউদ্দীন ওয়ালীর সৌজন্যে। 'হরূফুল কোরআন' পেয়েছি মেহেরপুরের চেংগাড়া গ্রামের কবি আবদুল হামিদ কাব্যবিনোদের বাড়ি থেকে। সবিনয়ে এঁদের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করছি।

গ্রন্থভুক্ত দলিল তিনটি কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই মুদ্রিত হলো।

আবুল আহসান চৌধুরী

বাঙলা বিভাগ
কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ, কুষ্টিয়া
ফাল্গুন ৮, ১৩৯৪
ফেব্রুয়ারি ২১, ১৯৮৮

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

বাঙলাদেশ ভাষা সমিতির পক্ষ থেকে 'ভাষা-আন্দোলনের দলিল' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। বইটি বিশেষ পাঠক-সমাদর লাভ করে, ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে এর প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু নানা কারণে এর পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

দীর্ঘ দশ বছর পর বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। এর কৃতিত্ব আমার পরম সুহৃদ্ কাশবন প্রকাশন-এর স্বত্বাধিকারী জনাব আমিনুল ইসলামের। মূলত তাঁর আগ্রহ ও উদ্যোগেই এর প্রকাশনা সম্ভব হলো।

দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত হলো ভাষা-আন্দোলনের স্মৃতিবিষয়ক বাউলকবি ফকির মহিন শাহের সাক্ষাৎকারভিত্তিক একটি রচনা।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে সম্মানিত ও বাধিত করেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

এই বই প্রকাশে যাঁরা আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের কথাও এই সূত্রে স্মরণ করি। এই সঙ্গে আশাকরি বইটির বর্তমান সংস্করণও সুধীপাঠকের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হবেনা।

আবুল আহসান চৌধুরী

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ঃ আনিসুজ্জামান ১১

ভূমিকা ১৩

হরূফুল কোর-আন ৩৩

হরফ সমস্যা ৪৯

ষড়যন্ত্রকারীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ৭৪

ভাষা-আন্দোলনের অলিখিত অধ্যায় ঃ ফকির মহিন শাহের ভাষ্য ৮৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

ইতিহাস সম্পর্কে এবং ইতিহাসকে জানার ও তা রচনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা বোধহয় ক্রমেই এক ধরনের সচেতনতার পরিচয় দিচ্ছি। আগে শোনা কথার ভিত্তিতে অনেক কিছু বলতাম ; এখন মুখে-বলা কথাও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য স্থানকালপাত্রের উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়। তথ্য পরিবেশন এবং তা যাচাই করার বিষয়ে অনেকেই সতর্ক হয়েছেন। এখন আমরা দলিলপত্র এবং সমকালীন সাক্ষ্যের পার্থক্য করতে শিখেছি, আবার দুয়েরই যে-গুরুত্ব আছে, তা বুঝতে পেরেছি।

আমাদের ইতিহাসের নানা পর্ব সম্পর্কে দলিলপত্রের অভাব আমাদের পীড়িত করে। বদরুদ্দীন উমরের তিন খণ্ড *পূর্ব বাংলার ভাষা-আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (১৯৭০-৮৫) সমকালীন ইতিহাসের প্রথম তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ। এই কাজে সংগৃহীত তথ্যাদি তিনি পরে *ভাষা-আন্দোলনের দলিল* (১৯৮৪-৮৫) নামে দু খণ্ডে প্রকাশ করেন বাংলা একাডেমী থেকে। বাংলা একাডেমী আবার নিজেদের উদ্‌যোগে ভাষা-আন্দোলনসংক্রান্ত দলিল ও স্মৃতিকথা কয়েক খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। আবদুল হকের *ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব* (১৯৭৬) বইতে ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে কিছু আদি নিবন্ধ সংকলিত হয়েছে—তারও গুরুত্ব কম নয়। নানা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে হাসান হাফিজুর রহমান — এবং পরে কে এম মোহসীন — সম্পাদিত ১৫ খণ্ডের *বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধ : দলিলপত্র* (১৯৮২-৮৪) এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংকলন।

ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে কিছু দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহ করেন আবুল আহসান চৌধুরী এবং তা *ভাষা-আন্দোলনের দলিল* নামে ১৯৮৮ সালে প্রকাশ করেন বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি। দশ বছর পরে বর্ধিত কলেবরে বইটি পুন: প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম প্রকাশকালে এতে সংকলিত হয়েছিল *হরূফুল কোর-আন* পত্রিকার নির্বাচিত অংশ, দূরদর্শী-ছদ্মনামে রচিত *হরফ সমস্যা* এবং পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে ২৪ মার্চ ১৯৫২ তারিখে প্রদত্ত পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীনের বক্তৃতা—সরকারিভাবে পুস্তিকাকারে প্রকাশের সময়ে তার নামকরণ হয়েছিল *ষড়যন্ত্রকারীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন*। শেষোক্তটি পাওয়া অত কঠিন নয়, কিন্তু প্রথম দুটিই দুষ্প্রাপ্য। নতুন সংস্করণে 'হরূফুল কোর্-আন' থেকে আরো কিছু অংশ সংকলিত হয়েছে। তাতে আমাদের জানার পরিধি কিছু বাড়বে।

www.pathagar.com

'হরূফুল কোর্-আনে'র সম্পাদক মওলানা জুলফিকার আলী ১৯৩৫ সাল থেকেই আরবি হরফে বাংলা লেখার আন্দোলন করে আসছিলেন। পাকিস্তানসৃষ্টির পরে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও অর্থসাহায্য তাঁকে এই প্রয়াস চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে। তবে দূরদর্শীর রচনাটি যথার্থই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। দেশবিভাগের পরে 'আচমকা' পাকিস্তানের এই অংশের জনসাধারণ 'বাঙ্গালী' আখ্যায় অভিহিত হতে আরম্ভ করলো — এইখানেই তাঁর যতো আপত্তি। বাংলায় আরবি হরফের প্রবর্তন পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সংযুক্তির প্রয়াস ব্যর্থ করবে, হিন্দু-মুসলমানের 'কমন কালচারে'র বিগ্রহ ধ্বংস করবে এবং রসুলুল্লাহ্‌র ইচ্ছা পূর্ণ করবে — এটিই তাঁর বক্তব্য। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫০ সালে প্রকাশিত *Arabic & Bengali Scripts* নামে পুস্তিকায় গোলাম মোস্তফা বাংলা বর্ণমালাকে পৌত্তলিকতায় পরিপূর্ণ এবং পাকিস্তানের ও বাংলা বর্ণমালার সহাবস্থান অসম্ভব বলে ঘোষণা করেছিলেন।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুআরির আত্মদানের পরে আরবি হরফ প্রবর্তনের প্রয়াস বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও এর বাস্তব প্রয়োগের জন্য কুড়ি বছরের সময় নেওয়া হয়। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে ওই বিধান অক্ষুণ্ন রাখায় বাংলা প্রয়োগের প্রশ্নটি আরো ছ বছর পিছিয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ায় ওসব বিধানের আর কোনো কার্যকরতা থাকে না এবং ১৯৭২ সালে প্রবর্তিত বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয় : 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।'

কিন্তু গত ২৬ বছরে বাংলাভাষা-প্রচলন সম্পর্কে দেশের মধ্য থেকেই অনেক ধরনের বাধা দেখা দিচ্ছে এবং বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে অমুসলমান উপাদান চিহ্নিত করে তা বর্জন করার একটা রাজনৈতিক প্রয়াসও দেখা দিচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আবুল আহসান চৌধুরীর *ভাষা-আন্দোলনের দলিল* সংকলনটির মূল্য আরো বেড়েছে। ইতিহাসের যে-টুকরো এতে ধরে রাখা হয়েছে, তা একই সঙ্গে অনেকের দর্পণেরও কাজ করবে।

আমি সংকেলককে অভিনন্দন জানাই।

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আনিসুজ্জামান
৩ ফেব্রুআরি ১৯৯৮

www.pathagar.com

ভূমিকা

এক

রাষ্ট্রভাষা-বিতর্ক ও ভাষা-সংস্কার প্রয়াসের সরণি বেয়ে ভাষার সংগ্রাম চূড়ান্ত রূপ পায় একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনে। ভারত-বিভক্তির কিছুকাল পূর্ব থেকেই পাকিস্তানের পূর্বাংশের ভবিষ্যত রাষ্ট্রীয় ভাষা কি হবে সে-সম্পর্কে আলোচনা-সুপারিশ, বাদ-প্রতিবাদ চলতে থাকে। এই প্রসঙ্গের পাশাপাশি বাঙলা লিপি-পরিবর্তন, বানান ও ভাষা-সংস্কারের বিভিন্ন প্রস্তাব ও উদ্যোগের পরিচয়ও মেলে।[১] ভাষা-সম্পর্কিত এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তথ্য-দলিল ভাষা-আন্দোলনের সামগ্রিক ইতিহাস-রচনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ।

২

উপর্যুক্ত বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে তিনটি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল সংকলিত হলো : মওলানা জুলফিকার আলী সম্পাদিত 'হরূফুল কোরআন' পত্রিকার নির্বাচিত অংশ, 'দূরদর্শী' ছদ্মনামে রচিত 'হরফ সমস্যা' ও 'ষড়যন্ত্রকারীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন' নামে পূর্ববঙ্গের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনের (১৮৯৩-১৯৭৪) ব্যবস্থা পরিষদে প্রদত্ত ভাষণ-পুস্তিকা। প্রথম দলিলে আছে আরবি হরফে বাঙলা প্রচলনের নিদর্শন, দ্বিতীয় পুস্তিকাটিতে পেশ করা হয়েছে আরবি হরফের বাঙলা-লিখনের প্রস্তাব ও তৃতীয়টিতে বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সরকারি বক্তব্য ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে ভাষা-আন্দোলনে বাউলকবি ফকির মহিন শাহের সম্পৃক্ততা-বিষয়ে একটি সাক্ষাৎকারভিত্তিক রচনাও, প্রাসঙ্গিক বিবেচনায়, সংযোজিত হয়েছে।

৩.

ধর্মীয় আবেগ ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আরবি হরফে বাঙলা লিখনের প্রস্তাব ও প্রয়াস যথেষ্ট প্রাচীন।[২] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে আরবি হরফে বাঙলা কাব্য-পুথি অনুলিখনের দৃষ্টান্ত মেলে। আরবি হরফে এই পুথি-লিপ্যন্তর

---

১. দ্র. আহমদ শরীফ : 'বাঙলা ভাষা-সংস্কার আন্দোলন'। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬।
২. মুহম্মদ এনামুল হক : 'মনীষা-মঞ্জুষা' (২য় খণ্ড)। ঢাকা, নভেম্বর ১৯৭৬ ; পৃ.১৫৭।

www.pathagar.com

প্রয়াসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, "…. বাঙলা হরফ না-জানা মাদ্রাসা শিক্ষিতদের পড়ার জন্যে আরবী হরফে বাঙলা পুথি লেখা শুরু হয়।"[৩]

১৩২২ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'আল্-এসলাম' পত্রিকায় 'বাঙ্গালীর মাতৃভাষা' শিরোনামে 'খাদেমোল এনসান'ও (সম্ভবত ছদ্মনাম) আরবি হরফে বাঙলা লেখার পক্ষে বিশেষ যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন ঃ

> উর্দ্দুর ন্যায় আমাদের ভাষা আরবী অক্ষরে কায়দামতে লেখা হইলে আরব ও পারস্যের লোক অতি সহজে আমাদের ভাষা পড়িতে ও শিখিতে পারিবে এবং আমরাও তাহাদের ভাষা পড়িতে ও শিখিতে পারিব। আমাদের মাতৃভাষা আরবী অক্ষরে লিখিত হইলে নিশ্চয়ই তাহার প্রতি সাধারণের ভক্তি বেশী হইবে,… মুসলমানদের উচিত এই বিষয় যথাসাধ্য চেষ্টা করা।[৪]

নোয়াখালীর ফেনী থেকে আগত চট্টগ্রামের জে. এম. সেন স্কুলের আরবি-ফারসির শিক্ষক মওলানা জুলফিকার আলী (১৮৯২-১৩.১২.১৯৫৪) বিভাগ-পূর্ব-কাল (১৯৩৫) হতেই আরবি হরফে বাঙলা লেখার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই প্রয়াসের অংশ হিসেবে তিনি কয়েকটি পুস্তিকা রচনা, 'হরূফুল কোরআন' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ ও 'হরূফুল-কোরআন সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। 'হরূফুল কোরআন' পত্রিকাটি তাঁর প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রামের আলাবিয়া প্রেস থেকে মুদ্রিত হতো। পত্রিকাটি সম্ভবত ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত চালু ছিলো।[৫] কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'All India Muslim Educational Conference'-এ আরবি হরফে বাঙলা লেখার প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৬] দেশ-বিভাগের পর তিনি এই প্রয়াসে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তবে এই প্রয়াস যে কতো অসার ও অবাস্তব ছিলো সে-সম্পর্কে সরকারের উপর-মহল থেকে আদিষ্ট হয়ে মওলানা জুলফিকার আলীর 'হরূফুল কোরআন' মিশনের সাহায্যকারী একজন সরকারি কর্মকর্তা স্পষ্টই মন্তব্য করেছেন ঃ

> এ সময়ে 'হুরুফুল কোরান' নিয়ে খুব বাকবিতণ্ডা চলছে। মন্ত্রী মরহুম ফজলুর রহমান ও কোন কোন বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী অফিসার এ-বিষয়ে উৎসাহী

---

৩. আহমদ শরীফ : 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' (২য় খণ্ড)। ঢাকা, অগ্রহায়ণ ১৩৯০ ; পৃ. ৬৪৩।
৪. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম : 'সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত'। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭ ; পৃ. ৩৩৯-৪৫।
৫. ড. আহমদ শরীফের পত্র (আবুল আহসান চৌধুরীকে লিখিত : ১৬.৯.১৯৮৭)।
৬. বদরুদ্দীন উমর : 'ভাষা-আন্দোলন প্রসঙ্গ ঃ কতিপয় দলিল' (২য় খণ্ড)। ঢাকা, জুলাই ১৯৮৫ ; পৃ. ১০৬ : মওলানা রাগিব আহসানের 'Pakistan-Language Formula' পুস্তিকার তথ্য।

www.pathagar.com

ছিলেন। আমার ধারণা তাঁদের এই আন্দোলন ভুল ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছিল। আল্লার কালাম আরবী ভাষাতে নাজেল হয়েছিল। কোরান শরীফ কোন হরফে লিখিত হয়ে নাজেল হয়নি। অনেককাল পরে তা আরবী অক্ষরে লেখা হয়েছে। 'কাজেই হুরুফুল কোরান কথাটাই ভুল। আল্লার যেমন অজুদ নাই। আল্লার কালামেরও তেমনি অজুদ থাকতে পারে না।' বাংলা বর্ণমালার অনেক ধ্বনি আরবী বর্ণমালাতে নেই। কাজেই বাংলা ভাষা আরবী অক্ষরে লেখাতে অনেক প্রতিবন্ধক আছে। আবার জের, জবর, পেশ ইত্যাদি হরকত ব্যবহার না করলে আরবী অক্ষরে লেখা বাংলার পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব। বাংলা ভাষা সৃষ্টি থেকে বাংলা অক্ষরে লেখা হচ্ছে। আলাওলও তাঁর কাব্য লেখেন বাংলা অক্ষরে। উনবিংশ শতাব্দীতে বোধহয় চট্টগ্রামের কেউ কেউ আরবী অক্ষরে বাংলা লেখার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টা অচিরেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৭]

৪.

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অনুকূল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিমণ্ডলের কারণে এবং সরকারি উৎসাহে উর্দু বা আরবি হরফে বাঙলা বর্ণমালা রূপান্তরের প্রস্তাব ও প্রয়াস বিশেষ মদত লাভ করে। সরকারি অনুমোদন ও সহযোগিতার পাশাপাশি এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কিছু নিবেদিত-প্রাণ বাঙলাভাষা-বিরোধী ব্যক্তির আন্তরিক উদ্যোগ। এই প্রয়াসের মূল উদ্দেশ্য ছিলো, বাঙলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তা ও বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা এবং রাষ্ট্রভাষার দাবী থেকে বাঙলাকে দূরে সরিয়ে রাখা। বর্ণমালা-বিলোপের এই ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধিতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিই ছিলো প্রবল ও প্রধান, ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি বা বাস্তব বিবেচনা ছিলো একান্তই দুর্বল, প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে প্রায় অনুপস্থিত। পাকিস্তান আমলে আরবি হরফ প্রবর্তনের 'দার্শনিক' ও 'মূল প্রবক্তা' ছিলেন কেন্দ্রীয় বাঙালি মন্ত্রী ফজলুর রহমান (১৯০৫—১৯৬৬)।[৮] তাঁর সমর্থন, সাহায্য ও প্রেরণায় বুদ্ধিজীবী-শিক্ষাবিদ-সরকারি কর্মচারীসহ অনেকেই প্রকাশ্যে বা গোপনে এই প্রয়াসে যুক্ত হন। এঁদের মধ্যে অতি উৎসাহী উদ্যোক্তা হিসেবে পূর্ববঙ্গ সরকারের শিক্ষা দফতরের সচিব ফজলে আহমদ করিম ফজলী, টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক ওসমান গনি,

৭. সৈয়দ মুর্তাজা আলী : 'আমাদের কালের কথা'। চট্টগ্রাম, দ্বি-স, পৌষ ১৩৮২ ; পৃ. ২৯১।
৮. বদরুদ্দীন উমর : পূর্ব-বাঙলার ভাষা-আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' (১ম খণ্ড)। ঢাকা, নভেম্বর ১৯৭০ ; পৃ. ২৫৬।

www.pathagar.com

আরমানিটোলা স্কুলের শিক্ষক উর্দুভাষী বিহারী মওলানা আবদুর রহমান বেখুদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৯] প্রাদেশিক শিক্ষা দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারি মীজানুর রহমানের (১৯০০–?) নামও এই তালিকায় যুক্ত হতে পারে।[১০] তবে এ-বিষয়ে সর্বাপেক্ষা কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন চট্টগ্রামের মওলানা জুলফিকার আলী।

মন্ত্রী ফজলুর রহমানের সুপারিশ ও উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গে আরবি হরফে বাঙলা প্রচলন ও শিক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। আরবি হরফে বাঙলা শিক্ষার জন্য বয়স্ক-শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, আরবি হরফে বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা-মুদ্রণ-বিতরণ এবং লেখকদের উৎসাহ-পুরস্কার প্রদান—এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। বয়স্ক-শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব-বাঙলার জন্য ১৯৪৯ সালে ৩৫,০০০ টাকা ও ১৯৫০ সালে যে ৬৭,৭৬৪ টাকা বরাদ্দ করেন তার সম্পূর্ণই খরচ করা হয় 'আরবী হরফে বাংলা প্রচলনের প্রচেষ্টায়'।[১১] এ-ছাড়া আরবি হরফে বাঙলা প্রচলনের জন্য বিশেষ শিক্ষা-কর্মকতা নিয়োগ ও স্ট্যাণ্ডিং কমিটিও গঠন করা হয়।[১২]

কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি প্রাদেশিক সরকারও আরবি হরফ প্রচলনের ছদ্ম-উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালে পূর্ব-বাঙলা সরকার আরবি হরফে প্রাথমিক শিশু-শিক্ষা প্রবর্তন করেন।[১৩] অবশ্য এর তিনবছর পূর্বেই (৮ এপ্রিল, ১৯৪৮) পূর্ব-বাঙলা সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবীবুল্লাহ্ বাহার (১৯০৬–১৯৬৬) ব্যবস্থা-পরিষদে বাঙলায় আরবি হরফ প্রচলনের পক্ষে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন ঃ

> বাঙলায় আরবী অক্ষরের প্রবর্তন হলে যদি আমাদের সুবিধা হয়, ছাপা টাইপরাইটার ইত্যাদি ব্যাপারে আরবী অক্ষর অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রমাণ হয়, নিশ্চয়ই আমরা এ অক্ষর গ্রহণ করবো।[১৪]

পরবর্তীকালে অবশ্য প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে

---

৯. ঐ, পৃ. ২৫৮–৫৯।
১০. সাপ্তাহিক 'সৈনিক'; ডিসেম্বর ৩, ১৯৪৯। মীজানুর রহমানকে এই পত্রিকায় 'উর্দু হরফের জন্য প্রধান পাণ্ডা' বলে উল্লেখ করা হয়।
১১. 'পূর্ব-বাঙলার ভাষা-আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' (১ম খণ্ড)। পৃ. ২৬৮।
১২. ঐ; পৃ. ২৬৯।
১৩. ঐ; পৃ. ২৭০।
১৪. ঐ; পৃ. ১৫০

www.pathagar.com

বিরোধিদলের চাপের মুখে (২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২) আরবি বা উর্দু হরফ প্রচলনে প্রাদেশিক সরকারের কোন উদ্যোগ বা সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন।[১৫]

১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ গঠিত 'পূর্ব বাঙলা ভাষা কমিটি'র 'উর্দু হরফ সাব-কমিটি' তার প্রতিবেদনে বাঙলার পরিবর্তে উর্দু (আরবি) হরফ প্রবর্তনের সুপারিশ করেন।[১৬] অবশ্য মূল কমিটি এই সুপারিশ অগ্রাহ্য করেন। ১৯৫১ সালে ঢাকায় শর্ষিনার পীরসাহেব মওলানা নিছারউদ্দীন আহমদের (আ. ১৮৭২-১৯৫২) সভাপতিত্বে ও মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-র (১৮৬৮-১৯৬৮) উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ হুরূফুল কোরআন সম্মেলনে আরবি হরফে বাঙলা-লিখন পদ্ধতিকে সমর্থন করা হয়। ১৯৫১ সালের ১৫ জানুয়ারি সিলেটে অনুষ্ঠিত জমিয়ত উলেমা-ই-ইসলাম সম্মেলনেও বিষয়টি সমর্থিত হয়।[১৭] বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও পাকিস্তান গণ-পরিষদের স্পীকার তমিজউদ্দীন খানও (১৮৮৯-১৯৬৩) আরবি হরফ প্রবর্তনের সমর্থক ও উদ্যোগী ছিলেন বলে জানা যায়।[১৮] আদিবাসী কবিরপন্থী নেতা স্বামী কালযুগানন্দও আরবি হরফে বাঙলা প্রচলনের প্রস্তাব সমর্থন করে ৭ এপ্রিল ১৯৪৯ সালে করাচিতে বলেন ঃ

> বাঙলা বর্ণমালাকে আরবি বর্ণমালায় রূপান্তরিত করলে তার সম্পদ ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পেয়ে তা পুনরুজ্জীবিত হবে এবং ইসলামী রেনেসাঁর সঙ্গে তার বলিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে।[১৯]

আরবি (বা উর্দু) হরফে বাঙলা লেখার পক্ষে সরকারি উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার পাশাপাশি বুদ্ধিজীবীরাও বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। 'পূর্ব বাঙলা ভাষা কমিটি'র প্রথম সম্পাদক কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪),[২০] অধ্যক্ষ শাইখ শরফুদ্দীন (১৯০০-১৯৮৪), সাংবাদিক মুজিবর রহমান খাঁ (১৯১০-১৯৮৪), অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন (১৯২১-১৯৯৬), অধ্যাপক খলিলুর রহমান, ড. সৈয়দা ফাতেমা সাদেক প্রমুখ খ্যাত-

---

১৫. ঐ ; ৩য় খণ্ড : চট্টগ্রাম, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ ; পৃ. ৩৫৩।
১৬. ঐ ; ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮১।
১৭. 'ভাষা-আন্দোলন প্রসঙ্গ : কতিপয় দলিল' (২য় খণ্ড), পৃ. ১০১।
১৮. ঐ ; পৃ. ১৮৫।
১৯. বশীর আলহেলাল : 'ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস'। ঢাকা, অক্টোবর, ১৯৮৫ ; পৃ. ৬৩৬।
২০. ইনি পরে মত পরিবর্তন করেন এবং আরবি হরফ প্রবর্তনের বিরোধিতা করে প্রবন্ধ রচনা করেন ('আরবী হরফে বাংলা' : 'দিলরুবা', অগ্রহায়ণ ১৩৫৮)।

www.pathagar.com

অখ্যাত বুদ্ধিজীবী পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে এ-বিষয়ে তাঁদের সমর্থন পেশ করেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদ সৈয়দ আলী আহসানও (জ. ১৯২২) উর্দু (আরবি) হরফ প্রবর্তনের সমর্থক ছিলেন বলে জানা যায়।[২১] দৈনিক 'আজাদে'র ভূমিকাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। পক্ষান্তরে কিছু পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবী-শিক্ষাবিদ হরফ পরিবর্তনের যুক্তি খণ্ডন ও অগ্রাহ্য করে এর বিরোধিতা করেন। এঁদের মধ্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯), ড. মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২), আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৬), মোহাম্মদ ফেরদাউস খান (জ. ১৯২২) ও আবদুল গফুরের (জ. ১৯২৯) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), ড. কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), কবি জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬)-এঁরাও আরবি হরফে বাঙলা লেখার বিপক্ষে ছিলেন এবং এই প্রয়াসের বিরোধিতা করেন।

উর্দু সম্পর্কে পূর্ববঙ্গবাসীর অনীহা, প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার কারণে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙলার দাবীকে উপেক্ষা করে সরাসরি উর্দুর দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে না পেরে এর উদ্যোক্তারা তাঁদের কৌশল কিছুটা পরিবর্তন করেন। বাঙলার দাবিকে খারিজ করার জন্য তাঁরা আরবি ভাষার কাঁধে সওয়ার হয়ে বাঙলা বর্ণমালা-বিলোপের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই অনুমান হয়তো অসঙ্গত নয় যে ঃ

> আসলে আরবি অক্ষরের প্রতি মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে খিড়কির পথে তাদের উর্দুতে দীক্ষিত করে নেওয়াই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বলে মনে হয়।[২২]

হরফ পরিবর্তনের এই সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল গভীর ও সুদূরপ্রসারী। কেননা এই হরফ পরিবর্তন বাঙালির শিক্ষার নৈরাজ্য, সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব, জাতিসত্তার বিলোপ, জীবিকার সংকট, সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক বিপর্যয় অনিবার্য করে তুলতো। অবশ্য এই ষড়যন্ত্রের স্বরূপ সচেতন বুদ্ধিজীবীর কাছে উন্মোচিত হতে বিলম্ব হয়নি। আরবি হরফ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদকারী আবদুল হক তাই হরফ পরিবর্তনের ফলাফল সম্পর্কে স্পষ্টতই উল্লেখ করেন ('দৈনিক ইত্তেহাদ', মার্চ ২০, ১৯৪৯) ঃ

> —আরবি হরফ আর উর্দুভাষা গ্রহণের প্রশ্ন নিয়েও তাদের অবাঙালী উর্দুভাষীদের অপেক্ষা পশ্চাদপদ থাকতে হবে, কেননা উর্দু তাদের মাতৃভাষা নয়,

---

২১. 'ভাষা-আন্দোলন প্রসঙ্গ : কতিপয় দলিল' (২য় খণ্ড)। পৃ. ১৭১ (কবি জসীমউদ্‌দীনের চিঠি দ্র.)।
২২ আবদুল হক : 'ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব'। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬ ; পৃ. ২৮।

www.pathagar.com

> কাজেই এক্ষেত্রে তারা কখনোই উর্দুভাষীদের সমকক্ষ হতে পারবেনা। পক্ষান্তরে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়ে তাদের পশ্চিমবাংলার বাঙালীদের অপেক্ষাও পশ্চাদপদ থাকতে হবে। তারা অবাঙালীও হতে পারবেনা, বাঙালীও থাকতে পারবে না।[২৩]

সরকারি উদ্যোগে আরবি হরফে বাঙলা লেখার বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।[২৪] বিষয়টি পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদেও উত্থাপিত হয় (মার্চ ২৯, ১৯৪৯)। এ-বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের ভাষা কমিটির পক্ষ থেকে নঈমুদ্দীন আহমদ ১৯৪৯ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে সংবাদপত্রে এক প্রতিবাদ বিবৃতি প্রদান করেন। ১৯৪৯ সালের এপ্রিলের মধ্যভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ও বর্ণমালা বিবেচনার বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এই স্মারকলিপিতে আরবি হরফ প্রবর্তনের বক্তব্য ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা হয়। এর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন সভা-সমাবেশের মাধ্যমে তাঁদের প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। ঢাকা শহরের বাইরেও এই আন্দোলন গড়ে ওঠে। তমদ্দুন মজলিশও বিভিন্নভাবে এই প্রয়াসের বিরোধিতা করেন। বিশেষ করে এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'সৈনিক' এ-বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সচেতন শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীবৃন্দ প্রবন্ধ লিখে, বিবৃতি দিয়ে, সভা-সমিতিতে বক্তব্য পেশ করে এই প্রচেষ্টার বিরোধিতা ও প্রতিবাদ করেন। আরবি হরফ প্রবর্তন প্রসঙ্গে তর্ক-বিতর্ক ও বাদানুবাদে ভাষার প্রশ্নে বাঙালি-মানস বিশেষ সতর্ক, সচেতন ও চঞ্চল হয়ে উঠে। এই পরিস্থিতিতে দেশব্যাপী আসন্ন গণ-আন্দোলন ও গণ-বিক্ষোভের আশঙ্কা করে পূর্ববাঙলা সরকার এই বিতর্ক-বাদানুবাদ, বিক্ষোভ-অসন্তোষ নিরসনে ১৯৪৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর এক প্রেসনোট জারি করেন। এতে বলা হয় ঃ

> বাঙলাভাষা বর্তমান চালু হরফে লিখিত হইবে, কি আরবি হরফে লিখিত হইবে প্রদেশবাসীর স্বাধীন মতামতের দ্বারাই তাহা নির্ধারিত হইবে।[২৫]

আরবি হরফে বাঙলা প্রচলনের ষড়যন্ত্র বানচালের কৃতিত্ব মূলত সচেতন শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সংগ্রামী ছাত্রসমাজেরই প্রাপ্য। এ বিষয়ে রাজনৈতিক দল বা নেতৃবৃন্দের ভূমিকা ছিলো নিতান্তই দুর্বল ও গৌণ।

---

২৩. ঐ ; পৃ. ২৯।
২৪. 'পূর্ব-বাঙলার ভাষা-আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' (১ম খণ্ড)। পৃ. ২৬০-৬৮।
২৫ . ঐ ; পৃ. ২৬৬।

www.pathagar.com

৫.

'দূরদর্শী' ছদ্মনামে রচিত 'হরফ সমস্যা' নামের পুস্তিকাটি আরবি হরফে বাঙলা-লিখন কর্মসূচীর একটি পরিকল্পিত প্রয়াস। পুস্তিকাটি সুলিখিত এবং অনেকাংশে তথ্য ও যুক্তিনির্ভর। লেখকের নাম না জানা গেলেও, অনুমান করা চলে ছদ্মনামের অন্তরালে তিনি একজন খ্যাতিমান লেখকই। আরবি হরফের সপক্ষে যাঁরা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন, আলোচ্য লেখক তাঁদের কেউও হয়তো হতে পারেন। অথবা এই লেখক অসামান্য বুদ্ধিমান, এমন কেউ যিনি প্রচ্ছন্ন বা পরোক্ষভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, নানা কারণে প্রকাশ্যে বা স্বনামে এই বিতর্কের সঙ্গে জড়িত হতে চাননি বলে কৌশল করে ছদ্মনামের আশ্রয় নিয়েছেন। ঢাকার ৩৫ আশক লেনের প্রিন্টিং হাউস ছাপাখানা থেকে এম. কে. নাজির কর্তৃক মুদ্রিত এই পুস্তিকাটির প্রকাশকালের উল্লেখ নেই। পুস্তিকার সূচনায় বলা হচ্ছে, "সম্প্রতি কিছুদিন হইতে একটি বিতর্ক চলিয়াছে এবং তার তীব্রতাও রফ্‌তা রফ্‌তা বাড়িয়া চলিয়াছে।" আরবি হরফে বাঙলা বর্ণমালা রূপান্তরের উদ্যোগ ও সে বিষয়ে তর্কবিতর্ক ১৯৪৯ সালেই প্রবল ছিলো। তাই উপরের মন্তব্য অনুসরণ করে ধারণা করা চলে ১৯৪৯ সালের কোন সময়ে এ পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। 'সৈনিক' পত্রিকায় (মে ২৮, ১৯৫০) প্রকাশিত আবদুল গফুরের নিবন্ধ ('বাংলা ভাষা ও হরফ হত্যার নতুন ষড়যন্ত্র') থেকে জানা যায়, সরকারি অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত দূরদর্শী রচিত 'হরফ সমস্যা' পুস্তিকাটির একটি ইংরেজি অনুবাদও (Forsight : 'The script question') প্রকাশিত হয়েছিল। 'সৈনিক' পত্রিকায় (সেপ্টেম্বর ১০, ১৯৫০) 'আরবি হরফে বাংলা লেখার অভিযান' শীর্ষক প্রতিবেদনে 'দূরদর্শী' রচিত এই পুস্তিকাটির একটি 'বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা'ও করা হয়।[২৬] 'হরফ সমস্যা'র লেখক এই পুস্তিকাটিকে নিরপেক্ষ আলোচনা বলে অভিহিত করলেও তা ছিল একান্তপক্ষে একদেশদর্শী, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও পক্ষপাতমূলক আলোচনা। পরবর্তীকালে লিখিত মওলানা রাগিব আহসানের 'Pakistan-Language-Formula' (মার্চ, ১৯৫২) পুস্তিকায় 'দূরদর্শী'র অনেক যুক্তি, তথ্য, মত ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।[২৭] 'পূর্ব-বাঙলা ভাষা কমিটি' তাঁদের প্রতিবেদন পেশের জন্য যে-সব বইপত্রের সহায়তা পেয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন তার মধ্যে 'দূরদর্শী' রচিত পুস্তিকা-খানিও অন্যতম।[২৮]

---

২৬ . বশীর আলহেলাল : পূর্বোক্ত ; পৃ. ৬৪৯।
২৭. 'ভাষা-আন্দোলন প্রসঙ্গ : কতিপয় দলিল' (২য় খণ্ড)। পৃ . ৮১-১২৩।
২৮. 'পূর্ব-বাঙলার ভাষা-আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' (১ম খণ্ড)। পৃ. ২৭৯।

www.pathagar.com

'হরফ সমস্যা' নামের এই পুস্তিকাটি পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের কার্যক্রমের সমর্থনে, হয়তো বা তাঁরই প্রেরণায় রচিত ও আনুকূল্যে প্রকাশিত। আরবি হরফ প্রবর্তনের 'স্বাপ্নিক' মন্ত্রী ফজলুর রহমান বিভিন্ন সময়ে হরফ পরিবর্তন, জাতিগত ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, জাতীয় ঐক্য ও রাষ্ট্রীয় সংহতি সম্পর্কে যে-সব বক্তব্য ও যুক্তি পেশ করেছেন, এই পুস্তিকায় সেই বিষয়গুলোই গুছিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে।

এই পুস্তিকায় আরবি হরফে বাঙলা লেখার পক্ষে একদিকে যেমন বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে, অপরদিকে এর বিরোধী মত নানাভাবে খণ্ডনের চেষ্টা আছে। কখনো ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি, কখনো ধর্মীয় আবেগ আবার কখনো বা রাষ্ট্রীয় সংহতির দোহাই, জাতিগত বা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের বক্তব্য এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। অত্যন্ত কৌশলে সুচতুর যুক্তিজাল বিস্তার করে লেখক প্রমাণ করতে চান, আরবি হরফ প্রবর্তনের প্রয়াস উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার নামান্তর বা বিকল্প চেষ্টা নয়, বরঞ্চ এই প্রয়াস ধর্মীয় বিচারে এক পবিত্র পদক্ষেপ। মওলানা জুলফিকার আলীর উদ্যোগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লেখক বলেছেন, এই প্রয়াস দেশ-বিভাগের বহুপূর্বের এবং তা পূর্ববঙ্গবাসী একজন বাঙালির, কোন বিদেশীর এবং সাম্প্রতিক ভাষা বা হরফ বিতর্কের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। লেখক উল্লেখ করেছেন যে, স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ (সঃ) "স্বপ্নে তাহাকে (মওলানা সাহেবকে) দর্শন দান করিয়া এ কাজে অগ্রণী হইবার ভার তাঁর উপর সোপর্দ করেন।" এরপর লেখক জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে উজ্জীবিত ও ব্যবহার করার জন্য আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলেছেন, "যদি বলা যায় যে কোন বিদেশী ইহার অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিল, তবে সে বিদেশী আর কেউ নন, স্বয়ং মানব-শ্রেষ্ঠ রসূলে করিম (দঃ)।" লেখক মন্তব্য করেছেন, এই পথ ধরেই, অর্থাৎ আরবি হরফ গ্রহণের মাধ্যমেই, বাঙালি মুসলমানের ইহকাল ও পরকালের মুক্তি মিলবে এবং আরবি হরফ প্রবর্তিত হলে মনে করা হবে, "রসূলে করীমের ইচ্ছা পূর্ণ হইল।" ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্তি ও প্রতারিত করতে পাকিস্তান আমলে কায়েমি স্বার্থের প্রতিনিধিরা এমনিভাবে ধর্মের দোহাই দিয়েছেন—ব্যবহার করেছেন ইসলামকে, সাঁক্ষী মেনেছেন রসূল (সঃ)-কে।

বাঙলাভাষায় আরবি হরফ গ্রহণের প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে লেখক যে-সব যুক্তি, তথ্য ও মত উপস্থাপন করেছেন, তার সঙ্গে শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি-অর্থনীতি ও ধর্মীয় প্রশ্ন গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আরবি হরফের

www.pathagar.com

পক্ষে 'দূরদর্শী'র বক্তব্য হলো ঃ

ক. "হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য উপরকার নয়, বরং গভীরভাবে ভিতরকার এবং বুনিয়াদীও বটে" এবং এই দুই সম্প্রদায়ের কৃষ্টি-সংস্কৃতিও ভিন্ন। তাই লেখক হিন্দুয়ানী প্রভাব থেকে মুসলিম 'তাহজীব-তমুদ্দুন' রক্ষার জন্য আরবি হরফ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। কেননা "ভাষা, বর্ণমালা ও কালচার এ তিনের সম্বন্ধ অতি নিবিড়"। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-সম্প্রদায়ের উদ্যোগে " 'কমন কালচার'রূপ যে বিগ্রহের পূজা আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, সর্ব্বপ্রথম সে প্রতিমাকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে হইবে। আরবি হরফই হাতুড়ীস্বরূপ সে প্রতিমাকে চিরকালের জন্য চূর্ণ করিবে।" এইভাবে "বাঙলা অক্ষর বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর তমুদ্দনী প্রাধান্যের বিরাট সৌধ ভূমিসাৎ হইবে, কারণ এই অক্ষরই সেই সৌধ-কোণের বুনিয়াদ পাথর" এবং এইসঙ্গে ভারতে উর্দুর উপর দেবনাগরী লিপি আরোপের "দাঁতভাঙ্গা জওয়াব"ও দেওয়া যাবে।

খ. শিক্ষাপ্রসারে তুলনামূলকভাবে আরবি হরফের অধিক উপযোগিতার কথা লেখক উল্লেখ করেছেন। আরবি হরফের মাধ্যমে শিশুশিক্ষা ও বয়স্কশিক্ষা কার্যক্রম অত্যন্ত কার্যকর, সহজ ও দ্রুত হবে বলেও অভিমত দেওয়া হয়েছে। কোরআন শরীফের ভাষা আরবি এবং যেহেতু কোরআন শরীফই প্রত্যেক মুসলমানের 'সর্বপ্রথম পাঠ্য' সে কারণে মুসলিম ছেলেমেয়ে প্রথমে আরবি হরফের সঙ্গে পরিচিত হয়ে থকে। তাই আরবি হরফে বাঙলা লিখিত হলে একাধিক বর্ণমালা শিক্ষার 'কষ্ট' ও 'অসুবিধা' এড়ানো যেতে পারবে। বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের মতো পাকিস্তানেরও উচিত 'মাতৃভাষার আদি বর্ণমালা' বর্জন করে আরবি হরফ গ্রহণ করা। তাহলে বাঙালি মুসলিম শিশু পাকিস্তানি ও মুসলিম-বিশ্বের অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে 'একই সমতলে' দাঁড়াতে পারবে এবং বাঙলাভাষাও ফারসি, পশতু, সিন্ধি, মালয়ান ও ইন্দোনেশিয়ান ভাষার মতোই 'সমৃদ্ধ' ও 'পুষ্ট' হয়ে লাভ করবে 'নতুন জীবন'।

গ. আরবি হরফে বাঙলা প্রচলিত হলে পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য বাঙলা শিক্ষা সহজ হবে। ফলে তারা বাঙলার প্রতি অনুরক্ত হবে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে বাঙলা শিক্ষার সুযোগ পাবে। দুই-তিন সপ্তাহের শিক্ষায় একজন উর্দুজানা ব্যক্তি সহজেই "আরবি হরফে লেখা মুসলমানী বাংলায় চলনসই রকম জ্ঞান লাভ" করতে পারবেন, কিন্তু "বাঙলা অক্ষরের মারফতে ঐটুকু জ্ঞান হাসিল করিতে মাসের পর মাস চলিয়া যাইবে"। এইভাবে আরবি হরফ জাতীয় একাত্মতা ও রাষ্ট্রীয় সংহতির জন্য ঐক্যের সূত্র হতে পারবে।

www.pathagar.com

ঘ. ভাষাতাত্ত্বিক প্রশ্ন উত্থাপন করে 'দূরদর্শী' মন্তব্য করেছেন, বাঙলা হরফ "কতকগুলি মারাত্মক দোষে দুষ্ট"। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই তাই রোমান বা দেবনাগরী অক্ষর গ্রহণে আগ্রহী। অতএব পরিবর্তন যদি করতেই হয় তবে "চিরকালের তরে আরবি হরফকে গ্রহণ" করাই কর্তব্য। আরেকটি লিপিগত ত্রুটির কথা উল্লেখ করে লেখক বলেছেন, বাঙলা হরফের অক্ষমতার জন্য বাঙলাভাষায় প্রচলিত আরবি ফারসি শব্দের এমন উচ্চারণ বিকৃতি ঘটেছে যে তাদের মূল রূপই নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু যদি আরবি হরফ প্রবর্তিত হয়, তবে এইসব শব্দ 'নিজস্ব রূপ ও ধ্বনি' ফিরে পাবে এবং বাঙলা ও উর্দু এই দুই ভাষায় তাদের লিখন-প্রণালী অভিন্ন হয়ে যাবে।

ঙ. আরবি হরফ গ্রহণ করলে এই সুবিধা হবে যে, একই ধরনের টাইপ এবং একই শ্রেণীর কম্পোজিটার দ্বারা আরবি, উর্দু ও বাঙলা মুদ্রণের কাজ চলবে। এতে যথেষ্ট ব্যয়-সংকোচ হবে। 'আরবী হরফের দৌলতে' উর্দু ভাষাভাষীদের বাঙলা-শিক্ষার সুযোগ তৈরি হলে বাঙলা বইয়ের চাহিদা বাড়বে, ফলে লেখক ও প্রকাশকরাও লাভবান হতে পারেন,—"যাহা বর্তমান হরফকে আঁকড়াইয়া থাকিলে কিছুতেই হইতে পারেনা"।

চ. সম্প্রতি আরবি রাষ্ট্রভাষা করার যে দাবি উত্থাপিত হয়েছে, আরবি হরফ গ্রহণ ঐ দাবির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও পরিপূরক।

অতঃপর 'দূরদর্শী' তাঁর সমগ্র বক্তব্যের সার একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা-সূত্রে প্রকাশ করে বলেছেন ঃ প্রকৃতপক্ষে "... আমাদের সন্তানগণকে পাকিস্তানের তথা মুসলিম জাহানের অপর অংশসমূহের শিশুগণের সঙ্গে একই সমতলে দাঁড় করাইবার জন্য, হিন্দু কালচার ও ইসলামবিরোধী ভাবধারার গুরুভার হইতে ভবিষ্যত বংশধরদের মনকে মুক্ত করিবার জন্য, কালচারের নামে বিভেদ সৃষ্টির যে Wedge আমাদের মধ্যে দলাদলির সূত্রপাত করিয়াছে তাহাকে সমাজদেহ হইতে উপড়াইবার জন্য, পাকিস্তানের ঐক্যবন্ধনকে মজবুত করিবার জন্য এবং নিরক্ষর জনগণের মধ্যে দ্রুত শিক্ষাবিস্তারের জন্য আজ পর্য্যন্ত যতগুলি অত্যন্ত জরুরি ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হইয়াছে, আরবী হরফ গ্রহণ তন্মধ্য অন্যতম—সম্ভবতঃ ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জরুরী।" সামগ্রিক বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই "হরফ পরিবর্তন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মতই অপরিহার্য্য ও অনিবার্য্য" বলে 'দূরদর্শী' মনে করেছেন।

www.pathagar.com

আরবি হরফের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী দু'জন পণ্ডিতের (নামোল্লেখ না করে) মতের সমালোচনা করা হয়েছে এখানে। "বাংলা হরফের তুলনায় আরবি হরফগুলি নিকৃষ্ট এবং অনেক দোষ-ত্রুটিপূর্ণ"—এই মত পোষণকারী লেখকের বক্তব্যের সমালোচনা করে তা খণ্ডনের চেষ্টা আছে। সমালোচিত লেখক যে বেশ খ্যাতিমান ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ তা আপাত শ্লেষাত্মক 'লেখক স্বনামধন্য' ও 'লেখাটি .. পণ্ডিত্যপূর্ণ' ইত্যাদি মন্তব্যে বোঝা যায়। আমাদের অনুমান এই লেখক হয়তো ড. মুহম্মদ এনামুল হক হতে পারেন। দ্বিতীয় লেখক সম্পর্কে বলা হয়েছে, "একজন সরলচিত্ত প্রফেসার সাহেব"— ইনি "আরবী, বাংলা ও ইংরাজী অক্ষরমালার আপেক্ষিক লিখন-দ্রুতি ও পঠন-সুবিধা বিষয়ে কিছুটা একস্‌পেরিমেন্ট করিয়া এইসত্যে উপনীত হইয়াছেন যে, এইসব বিবেচনায় আরবী বর্ণমালার স্থান সর্বনিম্নে।" এই দ্বিতীয় লেখক শিক্ষাবিদ মোহাম্মদ ফেরদাউস খান।[২৯]

এই পুস্তিকায় দ্বিজাতি-তত্ত্বের সাংস্কৃতিক রূপকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন লেখক। পাকিস্তানীদের রাজনৈতিকভাবে যেমন তেমনি সাংস্কৃতিকভাবেও একজাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে এখানে। কেননা লেখক জানেন, "রাজনৈতিক ইত্তেহাদ বেশী টেকসই হয় না, যদি তাহাকে কালচারগত ইত্তেহাদের সিমেন্টে আঁটা না যায়"। কিন্তু পূর্ববঙ্গের মুসলমানের জাতিসত্তায় 'বাঙালি' পরিচয় এবং হিন্দুর প্রভাবপুষ্ট বাঙলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি এই পাকিস্তানি কালচার গঠনের অন্তরায় ও পরিপন্থী। ভাষা-বিতর্ক ও হরফ পরিবর্তনকে উপলক্ষ করে এইভাবে সাংস্কৃতিক-সাম্প্রদায়িকতার জন্ম ও লালন হয়েছিল পাকিস্তান আমলে।

লেখকের মূল উদ্দেশ্য ও প্রবণতাকে প্রচ্ছন্ন ও গুপ্ত রাখার চেষ্টায়, আলোচনার গুরুত্ব ও বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের জন্য কোথাও কোথাও আছে উর্দু-বিরোধিতার ভান, আবার নির্লিপ্ত-অপক্ষপাত আলোচনার ছদ্ম-ভঙ্গিও কখনো কখনো লক্ষণীয়। কিন্তু সতর্ক পাঠকের কাছে লেখকের কৌশল ব্যর্থ হয়েছে—উদ্দেশ্য গোপন থাকেনি। বাঙলাভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার বিরুদ্ধে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র কিভাবে সংগঠিত হয়েছিল তার গুরুত্বপূর্ণ দলিল 'দূরদর্শী' রচিত এই 'হরফ সমস্যা' পুস্তিকা।

---

২৯. Md. Ferdouse Khan : ' The Language problem of to-day.' Chittagong, December 1948.

www.pathagar.com

দুই

৬.

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন ভাষা-সংগ্রামের গৌরবময় অধ্যায়। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের (১৮৯৪-১৯৬৪) রাষ্ট্রভাষা-সম্পর্কিত বক্তব্যের (জানুয়ারি ২৭, ১৯৫২ ঃ ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভা) সূত্র ধরে বাহান্ন সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ ও ২২ তারিখে রাষ্ট্রভাষা বাঙলার দাবিতে ঢাকায় ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের নির্বিচার গুলিবর্ষণের ফলে বেশ কয়েকজন নিহত ও আহত হন, এইসঙ্গে গ্রেফতার হন বহুসংখ্যক ছাত্র-শিক্ষক-রাজনীতিবিদ-বুদ্ধিজীবী। এই স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলনকে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকার বিভিন্ন অপব্যাখ্যা দিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও নাশকতামূলক আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হন। এই ঘটনা সম্পর্কে প্রকাশিত সরকারি প্রেসনোটে তিনজনের মৃত্যু ও নয়জনের আহত হওয়ার সংবাদ স্বীকার করা হলেও ঘটনার কারণ নির্দেশ করা হয় এইভাবে ঃ

> .... সরকারের হাতে যে সকল সংবাদ আছে তাহাতে জানা যায় যে, বে-আইনী কার্যকলাপের দরুণ আজকের অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য দায়ী এমন একদল লোক, বিশ্ববিদ্যালয় বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত যাহাদের যোগাযোগ নাই।[৩০]

'মর্নিং নিউজ', 'সংবাদ' প্রভৃতি সরকার-সমর্থক সংবাদপত্রগুলোতেও ঘটনার বিকৃতিমূলক এই একই ধরনের প্রচারণা স্থান পায়।

৭.

একুশে ফেব্রুয়ারির পুলিশি নির্যাতন ও গুলিবর্ষণের ঘটনা সম্পর্কে ঐ দিন বিকেলেই পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে এক উত্তেজনাকর পরিবেশে তুমুল তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন পরিষদে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্যে প্রথমে পুলিশের গুলিবর্ষণ কিংবা তাতে নিহত ও আহত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন নি। পরে গুলিবর্ষণের বিষয়টি স্বীকার করলেও নিহত হওয়ার সংবাদ কৌশলে এড়িয়ে যান।

---

৩০. রফিকুল ইসলাম : 'ভাষা-আন্দোলন ও শহীদ মিনার'। ঢাকা, ১৯৮২ ; পৃ. ২৭।

www.pathagar.com

কিন্তু সচেতন পরিষদ সদস্যবৃন্দ সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেন। কেবলমাত্র বিরোধীদলই নয়, সরকারপক্ষীয় কোন কোন সদস্যও সরকারি ভূমিকায় নিন্দামুখর হয়ে উঠেন। 'সরকারী ভূমিকা' ও 'পুলিশী বর্বরতা'র প্রতিবাদে মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ (১৯০০-১৯৮৬) মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং 'আজাদ'-সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮) ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদে ইস্তফা দেন। 'সরকারী ভূমিকা' ও 'পুলিশী নির্যাতনে'র দায়দায়িত্ব সরকার প্রধান হিসেবে নূরুল আমীনের উপরেই বর্তায়। ব্যবস্থা পরিষদে যেমন তেমনি মুসলিম লীগের ভেতরে ও বাইরেও তাঁকে সমানভাবে সমালোচিত ও নিন্দিত হতে হয়। ছাত্রদের মৃত্যু ও অন্যান্য ঘটনা তাঁকে 'বিচলিত' করে তোলে এবং ভেতর ও বাইরের চাপে তিনি এতদূর পর্যন্ত অসহায় ও দুর্বল হয়ে পড়েন যে একসময় পদত্যাগের চিন্তাও করেন।[৩১] প্রকৃতপক্ষে একুশে ফেব্রুয়ারির পূর্বাপর ঘটনাপ্রবাহে তৎকালীন চীফ্ সেক্রেটারি ও কেন্দ্রীয় সরকারের ছদ্ম-প্রতিনিধি আজিজ আহমদের নীল-নক্শা অনুসারেই প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনকে তাঁর ভূমিকা পালন করতে হয়।

৮.

ভাষা-আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহকে ভিন্ন রূপে চিহ্নিত করে ও ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনকে সাতদিনের ব্যবধানে দু'বার বেতার-বক্তৃতা দিতে হয়। ভাষণ দু'টি ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৫২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ও ৩রা মার্চ সম্প্রচারিত হয়। প্রথম বেতার ভাষণটি সরকারি উদ্যোগে মুদ্রিত হয়ে বিমানযোগে সারাদেশে প্রচারিত হয়। ৩ মার্চের ভাষণটি পরে 'ভাষা-আন্দোলনের অন্তরালে' নাম দিয়ে সরকারি প্রচার-মাসিক 'মাহেনও' পত্রিকায় (এপ্রিল, ১৯৫২) প্রকাশিত হয়। এরপর নূরুল আমীন ২৪ মার্চ পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে 'ঢাকার সাম্প্রতিক গোলযোগ' সম্পর্কে একটি দীর্ঘ ইংরেজি ভাষণ প্রদান করেন। পরিষদের এই ভাষণটি তাঁর বেতার বক্তৃতার সম্প্রসারিত রূপ হলেও তিনি জানিয়েছেন যে, "তবে ইতিপূর্বে আমি যাহা বলিয়াছি, আজ তদপেক্ষা অধিক কতকগুলি তথ্য আপনাদের নিকট পেশ করিব।" তাঁর সবগুলো ভাষণ-বক্তব্যই একসুরে বাঁধা। পরিষদে প্রদত্ত এই ভাষণে মুসলিম লীগ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতাই প্রতিফলিত হয়েছে। আন্দোলনের মর্যাদা ও রূপকে বিনষ্ট ও বিকৃত করা

৩১. পূর্ব-বাঙলার ভাষা-আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' (৩য় খণ্ড)। পৃ. ৩৭৬।

www.pathagar.com

এবং জনগণকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখা ও বিভ্রান্ত করাই ছিল এই প্রচারণার মূল উদ্দেশ্য। প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণটি পরে 'ষড়যন্ত্রকারীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন' নামে বাঙলায় অনূদিত হয়ে সরকারি তথ্য দপ্তরের মাধ্যমে সারাদেশে প্রচারিত হয়। নূরুল আমীনের এই পরিষদ বিবৃতি শঠতা ও মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ, কৃত অপকর্মের সাফাই, বিকৃত-কাল্পনিক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্যে পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীলতার একটি শ্বেতপত্র।

ভাষা-আন্দোলন প্রসঙ্গে নূরুল আমীনের বক্তব্য-বিবৃতির উৎস সম্পর্কে জানা যায়ঃ

> .... উপরোক্ত দুই বেতার বক্তৃতা এবং তাঁর পরিষদ বক্তৃতার খসড়াও তাঁর একান্ত নিজস্ব ছিলোনা। এসব খসড়া তৈরীর ব্যাপারে চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমেদ, হোম সেক্রেটারী আজফার এবং শিক্ষা সচিব ফজলীসহ কেন্দ্রীয় সরকারের আমলাতান্ত্রিক এবং এক অর্থে প্রকৃত রাজনৈতিক এজেন্টদের যথেষ্ট হাত এবং চূড়ান্ত নির্দেশও সে সময়ে ছিলো।[৩২]

নূরুল আমীনের অজ্ঞাতসারে ও অনুমোদন ব্যতিরেকেই তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতিতে অনেক শব্দ, তথ্য ও বক্তব্য সংযোজন করা হতো। যেমন তাঁর প্রথম বেতার-বক্তৃতায় (২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২) শিক্ষা-সচিব ফজলে করিম ফজলী সংযুক্ত করে দেন যে, নারায়ণগঞ্জের এক মিছিলে 'যুক্ত বাংলা চাই' বলে শ্লোগান প্রদান করা হয় এবং এতে বোঝা যায় ভাষা-আন্দোলন বিদেশী শত্রু ও তাদের দালালদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত।[৩৩] এই বানোয়াট তথ্যটি প্রধানমন্ত্রীর পরিষদ-বক্তৃতাতেও অক্ষুণ্ন থাকে।

নূরুল আমীনের পরিষদ-বক্তৃতায় ভাষা-আন্দোলনের মূল চেতনা ও প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করার একটি সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই ভাষণে রাষ্ট্রভাষা বাঙলার দাবী আদায়ের সংগ্রাম 'ষড়যন্ত্র' ও 'গোলযোগ' হিসেবে চিহ্নিত। যে তত্ত্ব ও তথ্য এই বক্তব্যে পরিবেশন, প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া হয়েছে, তা অসত্য হলেও, ক্ষমতাসীনদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। প্রধানমন্ত্রী এই বক্তব্যেও চিরাচরিত পাকিস্তানি প্রচারণা-কৌশল হিসেবে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, জাতীয় সঙ্গীত, স্বাধীনতার সুরক্ষা, গণতন্ত্রের অস্তিত্ব, কম্যুনিষ্ট-হস্তক্ষেপ ও ধর্মের দোহাই

---

৩২ ঐ, পৃ. ৪৭২

৩৩ বদরুদ্দীন উমর : 'আমাদের ভাষার লড়াই'। চট্টগ্রাম, বৈশাখ-১৩৮৭ ; পৃ : ৫৯

www.pathagar.com

দোহাই দেওয়া হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলনের ব্যাপকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা লীগ সরকারকে যে বিশেষ আতঙ্কিত, চিন্তিত ও নাজুক অবস্থায় ফেলেছিল, এই বক্তব্যে তারও প্রমাণ মেলে।

৯.

ভাষা-আন্দোলন "বাহ্যত: ... বাংলাভাষার স্বপক্ষে নির্দোষ ও বাস্তবিকই ন্যায্য আন্দোলন" মনে হলেও, পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনের ভাষায় আসলে তা ছিলো, "বলপূর্বক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার, প্রদেশব্যাপী গোলযোগ সৃষ্টির এবং পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যাহত করার সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টাকে ছদ্ম আবরণ দেওয়ার একটি পন্থা মাত্র।" সরকার নাকি এমন প্রমাণও পেয়েছিলেন যে, "মুষ্টিমেয় কয়েকজন কম্যুনিষ্ট বিদেশী দালাল এবং হতাশ রাজনীতিক দেশের অভ্যন্তর হইতে রাষ্ট্র ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।"

'আন্দোলনের প্রস্তুতি' সম্পর্কে আভাস দিতে গিয়ে নূরুল আমীন বলেছেন যে, এই 'ষড়যন্ত্রের প্রথম নির্দশন' একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌ঘাটিত হলেও এর প্রস্তুতি-প্রক্রিয়া ছিল 'দীর্ঘদিনের'। প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য নেতিবাচক অর্থে হলেও সঠিক, কেননা "১৯৫২ সনের ফেব্রুয়ারী-অভ্যুত্থান পূর্ববাঙলার জনসাধারণের চার বছরের জমাট-বাঁধা বিক্ষোভেরই ব্যাপক বিস্ফোরণ। সারা দেশ জুড়ে মানুষের মনে যে আক্রোশ সঞ্চিত হয়েছিল, ঢাকার ছাত্রদের ও জনসাধারণের মনে তাই সাহস, শক্তি ও প্রেরণা জুগিয়েছিল।"[৩৪] প্রধানমন্ত্রীর কথামতো সরকার 'বিভিন্ন সূত্রে' এমন খবর পেয়েছিলেন যে, "পাকিস্তানের চিন্তাও একদিন যাহাদের কাছে অভিসম্পাত স্বরূপ ছিল" তাদের প্ররোচনায় "পাকিস্তানের অভ্যন্তরস্থ কতিপয় রাজনৈতিক সুবিধাবাদী ... বিগত বহু মাস ধরিয়া ... বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে বিভ্রান্ত করিতেছিল।" এরপর "নাশকতামূলক কার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তিরা" "আবেগোদ্দীপক ভাষা আন্দোলনের মধ্যে... তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ লাভ করে এবং তাহাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকে লুকাইয়া রাখার একটি ছদ্ম আবরণ খুঁজিয়া পায়।" প্রধানমন্ত্রী ভাষা-আন্দোলনের তথাকথিত 'ষড়যন্ত্র' সম্পর্কিত তথ্য পেশ করে বলেছেন, ভাষা-আন্দোলনকারীরা "দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবার এবং সরকারকে

---

৩৪. আবুল-কাসেম ফজলুল হক : 'একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলন'। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ ; পৃ. ২৩।

www.pathagar.com

ক্ষমতাচ্যুত করার" ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এই বিষয়ে সরকারের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত এই যে, "রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি ষড়যন্ত্রকারীদের হীন উদ্দেশ্যের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের একটি পন্থা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।"

ভাষা-আন্দোলনের মূল ধারাকে বিকৃত করতে গিয়ে নূরুল আমীন প্রকারান্তরে অবচেতনভাবে কিছু কিছু সত্যের উন্মোচন ঘটান। আন্দোলনকারীদের চরিত্র-হরণ করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে তাঁদেরকে সংগ্রামী ভাষাপ্রেমিক হিসেবেই একরকম স্বীকৃতি দিয়েছেন। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন যে কতোখানি সর্বাত্মক ও স্বতঃস্ফূর্ত ছিল তার ইঙ্গিত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকেই পাওয়া যায়। তিনি জানাচ্ছেন, সংবাদপত্র-টেলিফোন-টেলিগ্রাফ-রেডিও প্রভৃতি গণ-মাধ্যম এবং সরকারি কর্মচারী ও পরিষদ সদস্যদের মধ্যেও এই আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। দোকানপাট ও যানবাহনের তিনদিনের পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। প্রকৃতপক্ষে পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়ঃ

> প্রকৃতপক্ষে ১৯৫২ সনের ফেব্রুয়ারী-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানী ঢাকায় এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে সরকারের সম্পূর্ণ পতনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। আর গ্রামাঞ্চলে ও মফস্বল শহরগুলিতে প্রায় সর্বত্রই মানুষ নানাভাবে সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা, ক্রোধ, বিক্ষোভ ও অনাস্থা প্রকাশ করছিল।[৩৫]

এই স্বত:স্ফূর্ত আন্দোলনকে প্রতিহত ও সমর্থনহীন করার জন্য একে রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ হিসেবে প্রতিপন্ন করার সচেতন প্রয়াস আছে সরকারি প্রচারণায়। নারায়ণগঞ্জের এক মিছিলে 'জয় হিন্দ্' ও 'যুক্ত বাংলা চাই' শ্লোগান দেওয়া হয় বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, ভাষা-আন্দোলনের সমর্থনে প্রচারিত প্রচারপত্রও "দেশের বহিরাঞ্চল হইতে আমদানী করা হইয়াছে" বলে তিনি মন্তব্য করেন। তাই 'রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য' নিরস্ত্র মানুষের এই অহিংস আন্দোলন দমন করতে লীগ সরকারকে পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনীকেও কাজে লাগাতে হয়। বস্তুত এই পতনোন্মুখ নাজুক অবস্থায় "এক মিলিটারী ছাড়া আর কোন শক্তিই তখন সরকারের হাতে ছিলনা।"[৩৬] গণ-আন্দোলনের এই অভূতপূর্ব জোয়ার লীগ সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল বলেই আতঙ্কিত প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে

---

৩৫. ঐ, পৃ. ১৩।

৩৬. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত : 'একুশে ফেব্রুয়ারি'। দ্বি-স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫, পৃ. ১৩। কবিরউদ্দীন আহমদের প্রবন্ধ : 'একুশের ইতিহাস'।

www.pathagar.com

অন্তত পক্ষে সাতবার সরকারকে উৎখাত ও ক্ষমতাচ্যুত করার অভিযোগ উচ্চারিত হয়। ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনের বক্তব্য যে কতো বিকৃত, অতিরঞ্জিত ও অসত্য এবং গৃহীত ব্যবস্থা যে কতো নির্মম ও অযৌক্তিক ছিলো তার প্রমাণ মেলে খোদ প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সদস্য ও খুলনা জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি আবদুল সবুর খানের বিবৃতি থেকে। সবুর খান সরকারি দমননীতিকে 'অকারণ' ও 'অমানুষিক' বলে মন্তব্য করেন এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে কথিত 'ভারতীয় এজেন্ট' ও 'হিন্দু ষড়যন্ত্রে'-র ভিত্তিহীন অভিযোগেরও তিনি প্রতিবাদ করেন।[৩৭]

নূরুল আমীনের ভাষণে কম্যুনিস্ট-ভীতি ও বিদ্বেষ বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি ভাষা আন্দোলনকে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন বলে অভিহিত করেছেন। পাকিস্তান আমলে অবশ্য যে-কোন আন্দোলনের পেছনেই সরকার কম্যুনিস্টদের অদৃশ্য হাত দেখতে পেতেন ; জনগণকে বিভ্রান্ত করার এটি একটি জনপ্রিয় সরকারি প্রচারণা ছিল। এই প্রচার কৌশল কাজে লাগিয়ে নূরুল আমীন বলেছেন, "দেশে অরাজকতা সৃষ্টির অসদুদ্দেশ্যে সুপরিচিত কম্যুনিস্টদের অনুসৃত পন্থায় জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক ও উদ্বেগ সৃষ্টি এবং জনসাধারণকে হিংসাত্মক কার্যে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে যে ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল এসব কিছু অবশ্যই তাহারই অংশবিশেষ।" শুধু তাই নয়, নূরুল আমীন আবিষ্কার করেছিলেন, "সরকারকে উৎখাত করার জন্য কম্যুনিস্ট পার্টি" একটি সক্রিয় ও পরিকল্পিত ভূমিকা গ্রহণ করে এবং "লাল কালিতে সুপরিচিত কম্যুনিস্ট কায়দায় লিখিত ধ্বংসাত্মক প্রচারপত্র ও অত্যন্ত উত্তেজনপূর্ণ দেওয়াল-লিপি শহর ছাইয়া ফেলে।" ভাষা-আন্দোলনে কম্যুনিস্ট পার্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয় ভূমিকা ছিলো সে কথা সত্য। তবে নূরুল আমীনের ভাষণে কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কোনো ভিত্তি বা সত্যতা ছিলো না। ভাষা-আন্দোলনের বিরুদ্ধে মৌলবাদী-চেতনা উজ্জীবিত করার কৌশল হিসেবেই সেই সময়ে নিষিদ্ধ কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকার বিকৃত ব্যাখ্যা জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর পরিষদ-বক্তৃতার বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তি যে কতো দুর্বল ছিল, ভাষা-আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহের নিরিখে সহজেই তার প্রমাণ মেলে। তাঁর পেশকৃত

---

৩৭. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত : 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র' (১ম খণ্ড)। তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ : ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮২ ; পৃ. ৭০২।

www.pathagar.com

তথ্য কখনো কখনো এত আজগুবি ও হাস্যকর যে তাতে সত্যের বাষ্পটুকুও খুঁজে পাওয়া যায় না। সরকারি আহবানে সাড়া দিয়ে জনগণ ভাষা-আন্দোলনের সংশ্রব পরিত্যাগ করেন, এমন অবাস্তব তথ্যও ক্ষমতাসীন মহল প্রচার করেন। সরকারের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকেই এইসব স্থূল মিথ্যাচারে অংশ নিতে হয়। নূরুল আমীন এ-কথা কল্পনা করে বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন যে, তাঁর বেতার-বক্তৃতায় ভাষা-আন্দোলনের 'প্রকৃত স্বরূপ' উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পর জনসাধারণ তাঁদের ভুল (?) বুঝতে পেরে "ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পাকিস্তানের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সর্বত্রই সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে থাকেন।" তিনি সগর্বে এই তথ্য পরিবেশন করেছেন যে, "বিদেশী এজেন্টগণ ভাষা আন্দোলনকে কাজে লাগাইতেছে, জনসাধারণ একথা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ডাকে সাড়া দিয়াছেন।" পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাহায্যে তিনি "গণতন্ত্রকে সর্বাধিক গুরুতর সংকট হইতে রক্ষা" করেন। নূরুল আমীনের আশঙ্কা ছিলো, এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে না পারলে ভবিষ্যতে দেশবাসীর কাছে তাঁকে "শোচনীয় ব্যর্থতার অপরাধে অপরাধী" বলে গণ্য হতে হতো। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম পরিহাস, বরঞ্চ ভাষা-আন্দোলনে বিরোধী ভূমিকা পালনের জন্যই 'কালের আদালতে' তাঁকে 'অপরাধী' সাব্যস্ত হতে হয়েছিল।

পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে যে-দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন, বিরোধীদলের নেতা বসন্তকুমার দাস (১৯৮৩-১৯৬৫) তার উপর আলোচনা ও বিতর্কের দাবী জানালে তা প্রধানমন্ত্রী ও স্পীকার উভয়েই অগ্রাহ্য করেন।[৩৮] এই সিদ্ধান্ত লীগ-সরকারের অগণতান্ত্রিক মনোভাব এবং দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে। নূরুল আমীনের মূল্যায়নে ভাষা-আন্দোলন হলো 'সরকার উৎখাতে'র সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও রাষ্ট্রবিরোধী 'ষড়যন্ত্র' ; আর এই আন্দোলনের সংগঠক ও আন্দোলনকারীরা হলেন 'হতাশ রাজনীতিক', 'বিদেশী দালাল', 'দুষ্কৃতকারী' ও 'আযাদীর শত্রু'। এই দুর্বিনীত মন্তব্য থেকে প্রবীণ রাজনীতিবিদ, পরিষদ সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও অব্যাহতি পাননি। ক্ষমতার মোহের কাছে পরাজিত নূরুল আমীন-চক্র যে-কোনো গণদাবী ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ভেতরেই 'সরকার উৎখাতের' দুঃস্বপ্ন দেখেছেন, সেই পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই। পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনের পরিষদ-বক্তৃতা ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে মুসলিম লীগ শাসকগোষ্ঠীর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণাকে প্রতিফলিত করে।

---

৩৮. 'পূর্ব-বাঙলার ভাষা-আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' (৩য় খণ্ড)। পৃ. ৪৭২।

www.pathagar.com

তিন

১০

ভাষা-আন্দোলনে শিক্ষিত নগরবাসী মধ্যশ্রেণীর ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সে-ইতিহাস আমরা জানি। কিন্তু এই আন্দোলন মফস্বলবাসী কিংবা নিরক্ষর গ্রামীণ মানুষের চেতনাকেও যে নাড়া দিয়েছিল, উদ্বুদ্ধ করেছিল এই সংগ্রামে, সেই ইতিহাস অলিখিতই রয়ে গেছে। এই অজ্ঞাত অধ্যায়ের এক বিস্মৃত ব্যক্তিত্বের নাম ফকির মহিন শাহ (১৩১০–১৪০৩)। এই বাউলকবি ঘটনাচক্রে ভাষা-আন্দোলনের কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। সেই কাহিনী বিস্ময়কর।

বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির প্রাক্কালে এই লোকায়ত সাধনার ভাষ্যকার ভাষা-সংগ্রামের চেতনায় প্রাণিত হয়ে গান রচনা করেন এবং সেই গান চারণের মতো ঢাকানগরীতে গেয়ে বেড়ান। এরফলে তিনি পুলিশের হাতে নিগৃহীত হন। এরপর থেকে এই সমাজমনস্ক বাউলসাধক ভাবগান রচনার পাশাপাশি এমন কিছু গান রচনা করেন যার ভেতর দিয়ে স্বদেশ, সমাজ ও স্বাধীনতার চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। মূলত ভাষা-আন্দোলন ফকির মহিন শাহের এই সমাজমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গিকে গড়ে দিয়েছিলেন। এই সংকলনে ভাষা-আন্দোলনের এক অলিখিত অধ্যায় সম্পর্কে মহিন শাহের যে-ভাষ্য সংকলিত হয়েছে, তা-থেকে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের সঙ্গে এই সংগ্রামের যোগসূত্র যে-কতো গভীর ও আন্তরিক ছিলো তার প্রমাণ মেলে।

আবুল আহসান চৌধুরী

www.pathagar.com

হরূফুল কোরআন

কোর-আণীক অক্ষরে বিশুদ্ধ
কথ্যভাষার সাপ্তাহিক ধর্ম্মবার্ত্তা।

এডিটার
মওলানা জুলফিকার আলী
আলাবিয়া প্রেস, চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

কোর-আনীক অক্ষরে বঙ্গীয় বিশুদ্ধ
কথ্য ভাষার সাপ্তাহিক বার্তা।

سوم اول ا ز قران درس خواندن کی قوانی

Registered No. [illegible]

حـــروف الـــقران

হরূফ্ুল কোর্-আন

شفتاهیک "حروف القران" بنرتکا' چانگاؤن

جمادی الاول ۳ شومبار' چانکام ۱۸ شنکھا ১৮, সংখ্যা ১২ জুলাই
۱۳۵۶ ہجری مطابق ۱۲ جولائی ۱۹۳۷ سنہ بتشر ۵ -
ایڈیٹر مولوی نوید الرحمن بی-ایل - سب ایڈیٹر حکیم محمد
سلامت اللہ ایف' ڈی' ہے - پروپرائٹر مولوی ذوالفقار علی ۰

পত্রিকার মূল্যের হার। বার্ষিক— চট্টগ্রাম টাউনে ৸৹ ভিঃ পিঃ যোগে ১৷৹
নগদমূল্য ৴৫ পত্রিকার ঠিকানা—এডিটার হরুফুলকোরআন

আনোয়ারা প্রেস, চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

হরুফুল কোর-আন পত্রিকাখানি আরবী অক্ষরে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার উদ্দেশ্য ঃ—

১। যদি বঙ্গদেশে মক্তব ও প্রাইমারী স্কুলে বাংলা ভাষায় আরবী অক্ষর শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়, আমাদের বালক বালিকাগণ শিক্ষকের বিনা সাহায্যে কোর-আন শরীফের মত (রিডিং) পড়িতে পারিবে এবং উর্দু ভাষার বহু শব্দাদি বাংলার কথোপকথনের মধ্যে মিশ থাকায় তাহাও সহজে পড়িতে ও বুঝিতে পারিবে।

২। যদি বাংলা ভাষা আরবী অক্ষরে লিখিত না হয়, তবে সেই মোসলমানগণ আরবী অক্ষর মাত্রও জানে না, আরবী অক্ষর কিছু দিন অভ্যাস করার পর তাহা ছাড়িয়া দেয়, তাহারা নামাজের আবশ্যকীয় সূরা ইত্যাদি ও কোর-আন শরীফ, বাংলা অক্ষরে লিখিয়া পড়া আরম্ভ করিবে এবং আরবী অক্ষরে লিখা কোর-আন শরীফ পড়ার আর দরকার মনে করিবে না কিন্তু যদি বাল্যকালে বাংলা ভাষায় আরবী অক্ষরগুলি অভ্যাস করিয়া লয়, তবে তাহারা নিজে নিজেই ث-ح-ط-ع ইত্যাদি অক্ষরগুলির ঠিক উচ্চারণ করিয়া নমাজের সূরা ও কোর-আন শরীফ অনায়াসে পাঠ করিতে পারিবে।

৩। আমাদের বালক বালিকাগণ যে এক বৎসর বয়স হইলেই মায়ের মুখ হইতে শিখিয়া মামা, নানা শব্দগুলি উচ্চারণ করিতে পারে এবং তাহার পর হইতে ৫।৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত আরও কিছু কিছু শুনে শিখিয়া মাতৃভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিতে পারে, এই সময় তাহাদের পক্ষে আরবী, বাংলা ও ইংরাজি বর্ণমালা সমভাবে অজ্ঞাত থাকে। কিন্তু তখন আরবীর অল্প সংখ্যক বর্ণমালা (২৮টি অক্ষর মাত্র) শিক্ষা করিতে যেই সময় ব্যয় হয়, বাংলার ৫২টি অক্ষর পরিচয় করিতে এবং তাহার যুক্তাক্ষর ইত্যাদি শিক্ষা করিতে তদপেক্ষা অতিশয় সময় ব্যয় হইয়া থাকে। কারণ, এক অজ্ঞাত বস্তুর দ্বারা অপর একটি অজ্ঞাত বস্তুকে আয়ত্ব করা যে অত্যন্ত কঠিন, তদনুসারে আমাদের বালক বালিকাগণ অজ্ঞাত আরবী ভাষা আয়ত্ব করিতে অধিক কষ্ট পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা জ্ঞাত মাতৃ ভাষার সাহায্যে অজ্ঞাত বাংলা অক্ষরগুলি অভ্যাস করিতে সুবিধা পায় বলিয়া বাংলা অক্ষরগুলি সংখ্যায় অধিক হইলেও তাহাদের আকার ইকার ইত্যাদি সহজে অন্তরে গাঁথিয়া রাখিতে পারে। যদি আরবী অক্ষরগুলিও তদ্রূপ মাতৃ ভাষায় অভ্যাস করা হয়, তবে তাহাও উহারা সহজে মনে রাখিতে পারিবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

৪। আরবী অক্ষরগুলি বিদেশীয় আরবী, পার্সী, উর্দু ভাষায় শিক্ষা করিতে আমাদের বালক বালিকাগণ দুইটি বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়া থাকে যথা—১। কেবল শক্তিদ্বয়ের উপর নির্ভর করিয়া অজ্ঞাত আরবী ভাষাকে অজ্ঞাত আরবী অক্ষরে শিক্ষা করিতে স্মরণ শক্তির উপর অনর্থক জোর দিতে হয়। কারণ না বুঝিয়া স্মরণ করিতে হয় বলিয়া কেবল তাহাদের ঐ শক্তির অনর্থক ব্যয় হইয়া থাকে। ২। আরবী শব্দগুলি না বুঝিয়া পড়ার এবং বুঝিবার শক্তি একেবারে ব্যবহার না করায় ঐ শক্তিও দিন দিন কম হইতে থাকে। কারণ, বুঝিবার শক্তি পরিচালনা করা হয় না বলিয়া তাহা কখনও বৃদ্ধি পাইতে পারে না, বরং ঐরূপ যেই শক্তি স্বভাবতঃ প্রথমে জন্মিয়া থাকে তাহাও অভ্যাস অভাবে নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু যদি আরবী অক্ষরগুলি মাতৃ ভাষায় অভ্যাস করা হয়, তবে, জ্ঞাত শব্দের দ্বারা অজ্ঞাত অক্ষরগুলিকে সাধনা করায় স্মরণ শক্তিও বুঝিবার শক্তি সমভাবে পরিচালিত হইয়া উভয়ই স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। কারণ উভয় প্রকারের শক্তির ব্যবহার থাকায় কোন শক্তিকে অতিরিক্ত ভাবে খাটাইতে হইবে না। তাহাই উভয় প্রকারের শক্তি সমভাবে কাজ করিবার উপযুক্ত হইতে পারিবে।

উল্লিখিত যুক্তিগুলি চিন্তা করিলে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যদি মোসলমান বালক বালিকাগণ বাল্যকাল হইতে মাতৃ ভাষায় আরবী অক্ষরগুলি অভ্যাস করিতে থাকে, তাহা হইলে ২।৩ বৎসরের মধ্যে তাহারা আরবী অক্ষরের দ্বারা বাংলা ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবে। মাতৃ ভাষার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আরবী অক্ষরের আকার ইকারও মনে আটকিয়া থাকিবে। ইহাতে তাহারা আরবী অক্ষরে লিখিত ভাষাগুলি ও পবিত্র কোর-আন শরীফ অনায়াসে পড়িতে পারিবে।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষাকে আরবী অক্ষরে লিখার যুক্তি সঙ্গত কৈফিয়ৎ।

—:)•:—

মোসলমানদিগের পক্ষে কোর-আন শরীফ পড়া যে, ফরয তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কোর-আন শরীফের শব্দাদির উচ্চারণ ঠিক করিয়া পড়িতে হইলে তাহা আরবী অক্ষরেই পড়িতে হয় বলিয়া আমাদের বালক বালিকাগণকে আরবী অক্ষরে কোর-আন শরীফ শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু আরবী ভাষার শব্দাদি ইংরাজী ভাষায় বা বাংলা ভাষায় কথোপকথনের প্রচলন না থাকায় আমাদের শিশুগণ যে ভাষায় আরবী অক্ষরগুলি অভ্যাস করিতে থাকিয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের সম্মুখে কোর-আন শরীফ থাকে, কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত অতি কষ্টে আরবী অক্ষরগুলির আকার ইকার মনে রাখিয়া থাকে। কিন্তু কোর-আন শরীফ ছাড়িয়া যখন বাংলা ভাষায় কথা বলিতে আরম্ভ করে তখন কোর-আন শরীফের শব্দগুলি ভুলিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে যে অক্ষরগুলির আকার ইকারও মন হইতে মুছিয়া যায়। কিন্তু কিন্ডার গার্টেন বা বর্তমান বাংলা অক্ষরগুলি কথ্য ভাষায় অভ্যাস করায় "আমি" ও "তুমি" শব্দাদি মুখে উচ্চারণ করিতে আ + ম + ই ইত্যাদি অক্ষরগুলির আকার যেমন সর্বদা স্মরণ থাকে, আরবী অক্ষরগুলি কথ্য ভাষায় ব্যবহার না করায় যে অক্ষরগুলির আকার-ইকার তেমন স্মরণ থাকিতে পারেনা।

তাই আমরা দেখিতে পাই যে, হাই স্কুলের মোসলমান ছেলেরা আরবী ও পারস্য ভাষা আরবী অক্ষরে অভ্যাস করিতে যাইয়া ৩/৪ বৎসর যাবৎ অভ্যাস করার ফলেও পরীক্ষার ভয়ে পাঠ্য বহিগুলি অতি কষ্টে পড়িয়া থাকে কিন্তু এতকাল অভ্যাস করার পরেও ভালরূপে বা সুস্পষ্টরূপে তাহা পড়িতে ও উচ্চারণ করিতে পারে না ও অক্ষরগুলির আকার ইকার বাংলা অক্ষরের আকারের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে তাহাদের চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে না। সময় সময় (ح) "হি"কে (خ) খে (ر) "রে"কে (ز) "যে" (ا) "আলিফ"কে (ل) "লাম" পড়িয়া ফেলে। আরও দেখা যায় যে, কোন কোন ছাত্র আরবী ও ফার্সী ছাড়িয়া "পালি" ও "সংস্কৃত" ভাষাকে বাংলা অক্ষরে লিখিতে ও পড়িতে সুবিধা পাইয়া তাহাই পড়িয়া থাকে। কারণ, মৌলবী সাহেবের ঘণ্টা ব্যতীত অন্য কোন সময়ে ঐ অক্ষরে লিখা কোন কিছু পড়ার সুযোগ ঘটিয়া উঠে না বলিয়া ঐ অক্ষরগুলির আকার ইকার বাংলা অক্ষরের ন্যায় চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিতে পারে না। এই কারণে তাহারা আরবী ও পারস্য ভাষা পড়িতে আগ্রহ প্রকাশ করে না।

তাই আশা করি যদি আমাদের শিশুগণকে কোর-আন শরীফ ও উর্দু প্রাইমারী শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে কথ্য ভাষার শব্দাদির দ্বারা আরবী অক্ষরগুলি অভ্যাস করিতে দেওয়া হয় তবে "আমি" ও "তুমি" শব্দাদি মুখে উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ا + م + ى ও ت + م + ى অক্ষরগুলির আকার ইকার বাংলা অক্ষরের ন্যায় চক্ষের উপর ভাসিতে থাকিবে ও তাহাকে বিদেশীয় অক্ষর বলিয়া মনে হইবেনা, এবং যে অক্ষরে লিপি শব্দগুলি আরবী অক্ষরে লিখা শব্দাদির ন্যায় চক্ষের উপরেও ও পড়িতে পারিবে।

ইহা ব্যতীত আরও দেখা যায় যে বাংলা অক্ষরের তুলনায় আরবী অক্ষর অতি সংক্ষেপে ও অল্প সময়ে লিখা যায়, যথা একই প্রকার উচ্চারণের 'আ' অক্ষরের তুলনায় ا "আলিফ" 'ব' অক্ষরের তুলনায় (ب) "বে" অতি অল্প সময়ে লিখা যায়। অর্থাৎ বাংলা অক্ষরের তুলনায় আরবী অক্ষর লিখিতে কালি, কলম, কাগজ ও সময় সব কিছুই কম খরচ হইয়া থাকে। ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া বাংলা ভাষায় আরবী অক্ষরে এই পত্রিকা খানা প্রকাশ করিয়া সকলের খেদমতে পেশ করা হইল। আশা করি ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহার আবশ্যকতা বুঝিবেন ও ধর্ম গৌরব রক্ষা করিবেন।

خاکسار—

ذوالفقار علی .

www.pathagar.com

۲ حروف القران ۸۲ ـ صدر چاٹگام

با الله

ابنار دهرمیر اُنتی کامنا

কামনা উন্নতি দেশের আপনার

فرٰے چهی ابنار دهرمودابے

[illegible]

نهجے و نبج شماچکے دیچها یتو

[illegible]

رٰے اُنتےیتو دکی چهی • یا الله

[illegible]

امادیکے ایعن کرمیر تولیق

[illegible]

دان کرون جدارا امرا ادار

[illegible]

هدیاے مکنو تمیکے حمیبرتی

[illegible]

همت چینتاے ایدکی شت ترم

[illegible]

وتیبا هیتو کرے باری • یا الله

[illegible]

ابنار مجاهد دیغمبر گنیرُ بالخصوص

[illegible]

ابنار مها بیرِو حضرت محمد

[illegible]

مصطفی صلی الله علیه واله

وسلمیر طفیلے ابنار دربا یر ککور

[illegible] আপনার

دایجی جینو لنا ادیش پالنے

[illegible] আপনার [illegible]

نیجکو تهیکے وانسرتی

[illegible]

دهتر هتے بادور کرے باری

[illegible]

امین یا رب العالمین •

مرمن گن اے ابدارا جیمن

[illegible] আপনার — [illegible]

دیهور و بران نیے دنیالے

[illegible]

جیمن جابن کرین تدروب وزر

[illegible]

برادرا و جیبن دهارن کرے تهارا

[illegible]

جیمن کیچهو کال دنیار شوکه

[illegible]

دوکهو بهوک کرار پرمرے جاے

[illegible]

ابدار و زلی روپے میرتو موکهو

[illegible]

بقیبو هتے هتے • جدی اٹی

[illegible]

زروپ جیبن و مرن اینک شوکه

[illegible]

بوکه بهوک کرا جکتیر نیتی

[illegible]

ملے استهیر هتے تهکے تیا هاے

[illegible]

مادس و گورو چهاکلو مدمخ

[illegible]

۲ حروف القران ۸۲ صفحہ چاٹگام

وروبهيد كيي ملو ؟ ايك مانس

মানুষ এবং [illegible] কি আছেন-

كيرولے سيرسانمو جدب جلب

বলে জীব [illegible] হিসেবে

دنوی كوئے بارے • ورز ديك

[illegible]

ديكي ليئ كهو ترل ديكها جاسے ہے'

যে যায় দেখা সকলে [illegible] দিকে

باستبيكلى سيرسانهتا لبه كرار

[illegible] শ্রেষ্ঠ [illegible]

كيچمو كزن و مانسيز مددهے

বলে মানুষের ও জন্য কিছু

جوزمان اچھے ار تهائى ملو

গুণ আছেই আর সঙ্গে বর্তমান

'انسانيت' يا 'مانسنتذو - إلى

এই মনুষ্যত্ব বা ইনসানিয়াৎ

كون ني الله تعالے مانس ے دان

[illegible] মনুষ্যকে আল্লাহ তা'আলা অর্থাৎ

كريچهين بلے تهاديگ ے بهر

সব তাহাদিগকে বলে [illegible]

أوچے انسان سيئے ورماے چھين

করাইয়াছেন দিয়ে মান উচ্চ

"ولقد كرمنا بنى ادم وحملنا هم

فى البر و البحر ورزقنا هم من

الطيبات وفضلنا هم على كثير ممن

خلقنا تفضيلا" (سوره بنى

اسرائيل) معنى' ار دشچهى امرا

আমরা নিশ্চয়ই আর আদম

بني ادم (مانس) ے مان شنمان

দেখান মান

دیئے چھی' ار سوکھا زمین و

ও জমির [illegible] বাদ দিয়েছেন.

ددی شمودرو شرو استهاے

যাবে সৎ মন্দ রূপ

سواری ے بهروسن كرائےچھی

করাইয়াছি উত্তম [illegible]

ار نهادیگ ے پاک صاف و

[illegible] পাক তাহাদিগকে [illegible]

مزدار خوراک دان كريچهی'

করেছি দান খোরাক মজাদার

ار جهانیگ ے امرا پیدا كريچهی

করেছি পয়দা আমরা তাহাদিগকে আর

تهادر ونیکیر اپر تر امر (مانسیر)

শ্রেষ্ঠত্ব তাহাদের উপর অনেকের তাহাদের

فضیلت بزرگی و عزت قدر

মান ইজ্জত ও বুজর্গি ফজিলত

بازائے دیئے چھی •

দিয়ে দিয়ে বাড়িয়ে

• زبان *

ভাষা

الله تعالے ہے' مانس ے

যে মানুষ যে

ودهیک مان شذمان دیئےچھین

দিয়েছেন সম্মান মান অধিক

كهان' یا' مثلی نهار يكمائرو

[illegible] থাকে না [illegible]

www.pathagar.com

ازخون دل نوشتم نقش و نگار فرقان'
نامش ازان نهادم یارب حروف قرآن

কোর-আনীক অক্ষরে বঙ্গীয় বিশুদ্ধ কথ্য ভাষার সাপ্তাহিক ধর্ম্মবার্ত্তা।

بلدم اول‌ف با تا زهرانی ز قران درس‌خواند ن کی قرانی

Registered No. C-2150

آرزو دارم که با قرآن گذارم حال زار * چون سگ اصحاب کهف از وے نگردم از فکار
هم بوزم خون جانم چون علی جانثار * تا بخون خویش الایم حروفش بار بار

حـــروف القـــران

হরুফুল কোর্-আন

شفقنا هیک "حروف القران" پتریکا ۰ چاٹگاؤں

ذی القعدہ ۹ بار' چاٹگام شوم ۱۳۴ شنکها ৪৪ সংখ্যা ৯ ডিসেম্বর

۱۳۵۹ هجری مطابق ۹. دسمبر ۱۹۴۰ سنه ع بتشر ۸ -

اڈیٹر مولوی فوید الرحمن بی-ایل - سب اڈیٹر حکیم محمد

سلامت الله ایف' ٹی' ہے - پروپرائٹر مولوی ذوالفقار علی ۰

পত্রিকার মূল্যের হার। বার্ষিক— চট্টগ্রামটাউনে ৸৹ ভিঃ পিঃ যোগে ১৸৹ নগদমূল্য ৴৫ পত্রিকার ঠিকানা—এডিটার হরুফুল কোরআন, চট্টগ্রাম

আলাবিয়া প্রেস, চট্টগ্রাম

হরুফুল কোর-আন পত্রিকাখানি আরবী অক্ষরে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার উদ্দেশ্য।

১। যদি বঙ্গদেশে মক্তব ও প্রাইমারী স্কুলে বাংলা ভাষায় আরবী অক্ষর শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়, আমাদের বালক বালিকাগণ শিক্ষকের বিনা সাহায্যে কোর-আন শরীফ পাঠ করিতে পারিবে এবং উর্দু ভাষায় প্রায় শব্দাদি বাংলার কথোপকথনের সঙ্গে মিশ থাকায় তাহাও সহজে পড়িতে ও বুঝিতে পারিবে।

২। যদি বাংলা ভাষা আরবী অক্ষরে লিখিত না হয়, তবে যেই মোসলমানগণ আরবী অক্ষর মাত্রও জানেন না বা আরবী অক্ষর কিছুদিন অভ্যাস করার পর তাহা ছাড়িয়া দেয়, তাহারা নমাজের আবশ্যকীয় ছুরা ইত্যাদি ও কোর-আন শরীফ, বাংলা অক্ষরে লিখিয়া পড়া আরম্ভ করিবে এবং আরবী অক্ষরে লিখা কোর-আন শরীফ পড়ার কোন দরকার মনে করিবে না কিন্তু যদি বাল্যকালে বাংলা ভাষায় আরবী অক্ষরগুলি অভ্যাস করিয়া লয়, তবে তাহারা নিজে নিজেই ث ح ط ع ইত্যাদি অক্ষরগুলির ঠিক উচ্চারণ করিয়া নমাজের ছুরা ও কোর-আন শরীফ অনায়াসে পাঠ করিতে পারিবে।

৩। বঙ্গীয় বালক বালিকাগণ যে এক বৎসর বয়সী হইলেই মায়ের মুখ হইতে শিখিয়া "দাদা, নানা" শব্দগুলি উচ্চারণ করিতে পারে এবং তাহার পর হইতে ৫।৬ বৎসর পর্যন্ত আরও কিছু মুখে মুখে শিখিয়া মাতৃভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিতে পারে, এই সময় তাহাদের পক্ষে আরবী বাংলা ও অন্যান্য বর্ণমালা সমভাবে অজ্ঞাত থাকে। কিন্তু তখন আরবীর অল্প সংখ্যক বর্ণমালা (২৮টী অক্ষর মাত্র) শিক্ষা করিতে যেই সময় ব্যয় হয়, বাংলার ৫২টী অক্ষর পরিচয় করিতে এবং তাহার যুক্তাক্ষর ইত্যাদি শিক্ষা করিতে তদপেক্ষা অতি অল্প সময় ব্যয় হইয়া থাকে। কারণ এক অজ্ঞাত বস্তুর দ্বারা অপর একটী অজ্ঞাত বস্তুকে আয়ত্ত করা যে অত্যন্ত কঠিন, তদনুসারে আমাদের বালক বালিকাগণ অজ্ঞাত আরবী ভাষা অজ্ঞাত আরবী অক্ষরে আয়ত্ত করিতে অধিক কষ্ট পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা জ্ঞাত মাতৃভাষার সাহায্যে অজ্ঞাত বাংলা অক্ষরগুলি অভ্যাস করিতে সুবিধা পায় বলিয়া বাংলা অক্ষরগুলির সংখ্যা অধিক হইলেও তাহাদের আকার ইকার ইত্যাদি সহজে অন্তরে গাঁথিয়া রাখিতে পারে। যদি আরবী অক্ষরগুলিও তদ্রূপ মাতৃ ভাষায় অভ্যাস করা হয়, তবে তাহাও উহারা সহজে মনে রাখিতে পারিবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

৪। আরবী অক্ষরগুলি বিদেশীয় আরবী, পার্সী, উর্দু ভাষায় শিক্ষা করিতে আমাদের বালক বালিকাগণ দুইটী বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়া থাকে যথা—১। কেবল পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিয়া অজ্ঞাত আরবী ভাষাকে অজ্ঞাত আরবী অক্ষরে শিক্ষা করিতে মুখস্থ শক্তির উপর অনর্থক জোর দিতে হয়। কারণ না বুঝিয়া মুখস্থ করিতে হয় বলিয়া কেবল তাহাদের ঐ শক্তির অনর্থক ব্যয় হইয়া থাকে। ২। আরবী শব্দগুলি না বুঝিয়া পড়ায় এবং বুঝিবার শক্তি একেবারে ব্যবহার না করায় ঐ শক্তিও দিন দিন ক্ষয় হইতে থাকে। কারণ, বুঝিবার শক্তি পরিচালনা করা হয় না বলিয়া তাহা কখনও বৃদ্ধি পাইতে পারে না বরং ঐরূপ যেই শক্তি স্বভাবতঃ প্রথমে জন্মিয়া থাকে তাহাও অভ্যাস অভাবে নষ্ট হইয়া যায় কিন্তু যদি আরবী অক্ষরগুলি মাতৃ ভাষায় অভ্যাস করা হয়, তবে জ্ঞাত শব্দের দ্বারা অজ্ঞাত অক্ষরগুলিকে সাধনা করায় মুখস্থ শক্তিও বুঝিবার শক্তি সমভাবে পরিচালিত হইয়া উভয়ই স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে কারণ উভয় প্রকারের শক্তির ব্যবহার থাকায় কোন শক্তি অনির্বাচিত ভাবে খাটাইতে হইবে না। তাহাই উভয় প্রকারের শক্তি সমভাবে কাজ করিবার উপযুক্ত হইতে পারিবে।

উল্লিখিত যুক্তিগুলি প্রতি চিন্তা করিলে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে যদি মোসলমান বালক বালিকাগণ বাল্যকাল হইতে মাতৃ ভাষায় আরবী অক্ষরগুলি অভ্যাস করিতে থাকে, তাহা হইলে ২।৩ বৎসরের মধ্যে তাহারা আরবী অক্ষরের দ্বারা বাংলা ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবে। মাতৃ ভাষার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আরবী অক্ষরের আকার ইকারও মনে আটকিয়া থাকিবে। ইহাতে তাহারা আরবী অক্ষরে লিখিত ভাষাগুলি ও পবিত্র কোর-আন শরীফ অনায়াসে পড়িতে পারিবে।

www.pathagar.com

۱ حروف القران ۳۴	شنگها ۱۲ ذوالقعده چاٹگام

حروف القران

الخطبة الثانية

لشهر ذى القعدة

چاٹگام سنة ۱۳۵۹

۷۸۶

وبايدھوتار پرينام

الحمد لله الذى جعل
النار لمن بغى و طغى والجنة
لمن اتقى و صدق بالحسنى
والصلوة والسلام على رسوله
سيدنا و مولنا محمد الذى
ارسل الينا بالهدى و على اله
على اله و اصحابه اهل النهى
نشهد ان لا اله الا الله
رب السموات العلى ونشهد
ان سيدنا ومولنا محمدا عبده
و رسوله الذى وسيلتنا الى

الله المولى •

ومن گن؟ بغاوت و بايدھوكتار
بهاب برچان ھرا و قياماتير
فلاحت نه۔

ديكهون؟ الله تعالى آكاش و
پتال كے سيرشٹي كرے جے
كيرو پے تادر جابتيو پدارتھو
گلي كے سيرپنكهلا بن-دھو
كرنيچهين ابنك تارا جے كيرو پے
تانر آگيكا (أغا) بهوني وكرو كامي
اچھے تارئى بياپكهاے تيني
فرمائي چهين قل أ إنكم لتكفرون
بالذي خلق الارض فى يومين
وتجعلون له اندادا • ذلك
رب العلمين وجعل فيها
رواسي من فوقها وبارك فيها
وقدر فيها اقواتها فى اربعة
ايام سواء للسائلين • ثم استوى
الى السماء وهى دخان فقال
لها وللارض ائتيا طوعا او كرها

www.pathagar.com

۲ ، حروف القرآن ۴۴ شنکها ۲ ، ذوالقعده چانکام

قالتا اتینا طائعین ۰ هن سبع
سموات فی یومین واوحی
فی کل سماء امرها وزینا
السماء الدنیا بمصابیح وحفظا
ذلک تقدیر العزیز العلیم معنی
ابی رسول (صلی الله علیه
واله وسلم) ایئی بلے دین تمرا
دی ولی سیدریشتی کرتاے
وشیکار کرو جاهی الی بتره بی
کے مائی دیبشی سیریشتی
کریچهین ار تمرا تاثر شنگے
ونگشهدار بناو وتهبو تیتی
شمستو جگت شموهیر پروتیهالک
ارتیتی ایئی بهومندلیر مدھے
تاثر ایی بهاگے یتو کلی
بهاج سهریشتی کرین ایبنکے
تار مدهے برکت تهلیلی دین
ایبنک تار مدهے ۴ دیبشے یتا
بیدهو کهادیر بیبستها
کرے چهین ار تاثر برسنو

کاری کنیر جنمو اتمر سروپ تاهر
تهتی آکاهیر دیکے لکهو کرین
وتهچو تکهن تا دهوان (بابادهوم)
چهیلو تکهن شے آسمان و زمین کے
بلیلین تمرا ایبن ایچهاے …
ونیچهے چهاے اسار دیکے آشو
اسار اذیش پالیئے جوگدانے کرو
تیارا آمرا تکی بلیلو — امرا ایثار
اذیش پالنارتهے اپستهیت
آچهی تتپر ۲ دیبشے تاتے
۷ آسمانے پریتو کرین تتپر
شے ۷ آسمانے تاثر حکم
احکام جاری کرین ایبنگ ایکتے
برتتی آسمانے ونهک کلیلن
جونو … شهجیتو کرین
ایبنگ جیتو کاری کگن هتے
شیبهے رکها کرین اتار تالی
شکتی ثالی گیاتن الله تعالی
نیدرشن اکتو ایتنا شریف دارا
الله تعالی دیکهائے دین چهین

۳ حروف القرآن ۲۴ شنکها ۱۲ ذوالقعده جانکیم

شمستو سپریشذو وداتو الله تعالار
آدیش بالنی وکرو کامی ابندگ
تادر کیونی تادر آدیش بالنی
وبوهیلا کرینا ۔ تا چھاڑا ایتادر
ذیبجدر پروتی لکهور کرون چے
بنتهو ابندریو ابتادیکے ذیوا
هکنی چے اینگ تادر برتیک کے
یلک بکنی کاجیر جنیو
ذیجوانو کرے چھمن ۔ جدی
تارا نیج اچھمانے وبایکهو
هتی پڑے ابنگ کاج کرے
وشمکار کرے تهکین اپاڑا
کیروپ وبهانے برتن ؟ تار بروتی
چھینا بڑے چھمن کی ؟
تکهون وبایکهو کتار پروہانے
گی چے بوسرنکهون گهانے تا
ژدوبهب کرار هتلو
چنتار بذو دزکار نالی برتی
وتی شاعاستو چهنتار دارتی
تا ونوبهب هئی ۔ کارن ادنها

ابنکرا بوبار وبسنها دیکهی
وخاپانے وبی شکل وبهابر
کتها وترے استعمال باے
تائی مانوشیر کرتبو آلی چے
شے جنیو ... شمکر
برکرتیر چال چلنیر برتی
لکهور کرے تا کولے وبایهو
کتار باب و بروبهاب وتایانے
راجبب کرا جائے ۔ کهنتو وباینو
بیکتی کن ککهنو وبایکهو هتی چا اینا ۔
تارپر بریندی شماجے کول مال
سپریشتی هئی فسان بربا هگے
... عزت کارو تهکینو لوتو
مارو ماو ۔ ابها بالنی شکل
چونردیکے کهورے بیڑاے ۔ برتمانے
چے شکل وماذوشیکے کاذکو
مسلم شماجے ابسلویت هئی
چے ۔ تار مولے الله تعالار ذاذماتیر
بهاب ذیشچکی رئی چے ۔ اسرا

www.pathagar.com

۴ حروف القران ۴۴ شنکها ۱۲ ذوالقعدہ چانکم

جدی سیرشٹي کرتا الله تعالار
ادیش پالن کرتوم ' تینی
وریشو شکتي روبے شربو
بیابی آچهین اینگ شکل
سیشٹو پدارتهو کے پریچالنا
کرتے چهین بلے یقین کرتوم'
شت بدهے تهکتوم' و-نیابے و
ویشٹر شنگسراب برجن کرتوم'
حلال روزی حلال کامائی حلال
کهاید-دو جوگاڑ کرتوم' شت کاج
شت بهاب وباهین کرتوم'
اُپکار چهاڑا وپکار کربونا بلے
شنکلپو کرتوم' تا هلے شماجے
یکهنو چوري' ڈکایتی' بدمعاشی'
و-نیابے' وبیچار' تهکتے پارتونا
کیو کارو ونیشٹو کرتے شاهش
پیتونا' برو چهوٹو کے آدر کرتو
اینگ چهوٹو برو کے شمان
کرتو' بهائي بهالی آپشے
پرشپر پرشپریر هیتاکانکهی هتو'
کارو مندے کارو پروتی هینگشار
بهاب تهکتونا' پرو دربیر
پروتی کارو لوبه هتونا' دهن
دولت مان شمان لابه کرتے
پارلے تا نیئے کیو گربهو کرتونا
برنگ الله تعالار نعمت پرایٹو
هئے تادرئی درگاهے شکر کرتو'
بهکتی گیاپن کرتو.
تائی بلی آشون امرا
آندولن کرے شماجے الله تعالار
بهاب جگائي' شکل کے الله
تعالار بهکتو بنائے چیشٹا کری'
الله تعالار مددے امرا شئے چیشٹائے
شپهلتا لابه کرتے پاربو. الله
تعالی نیشچئی شرل کرچي
گنیر پک-کهو باتي . اشاکری
امار الی اهبانے شاڑا
دیبین والسلام .

৬ حروف القرآن ۱۲৪: شنبوار ৭ ذی ا تعریفہ چاٹگام

ডাঁকাতি

گوجران والا

کشمیر اِسا ے نی بهوا-لاوارا
گرامے شمپروتی یکتی ڈکاتی
هئیی گیاے چھے • ڈکات دل اُکتو
ڈاکانیدَے بندرق اِیَد-تانی بیوهار
کرے • بهلے اِل ذاتهو شار
بوترو گوروتر بهاے اهتو هن •
ڈاکات دل ۸۰ هازار تاکار
شمپد-تی لئے اُبهلورهئے • اُکتو
ڈاکاتی شمپرکے کشمیر
سِٹیہر پولیش پاوبنتو شینگ
چگت شینگ اِبنگ- ندوشرار
وپر یک بیکتی کے گرفتار کورے

জনৈকা স্ত্রীলোক জীবন্ত দগ্ধ

بار

اِئی شہریر سداله چئودیتے
گتو کلکاتار مددهو راترے یلک

এক সঙ্গে যুবক ও বৃদ্ধা খুন

کومیلا گنج

مکصود پور تهانار علاقه‌هین
بوتیکه ارِی گرامیر روتی کانتو
شها نامک ۵۰ بچهر بیشکو
جنوئیک گرام باشی اِبنگ
روتی کانتو شہار بستری کے
تاهار گیریهے نیهتو ربستهاے
پاوا گیہاے چھے • ارو جنا گیئے
چھے جے کے با کهارا کوتهار
راترے تانو گیریهے لوٹ تورازم
کورے پشری — هوتے چھے
بیرید-دہر بیرید-دارو مرتو دیہو
مکوتلا تدنتیر جنیو مرگے پیریتو
هئییه چھے

اِئی شمپرکے پولیش زورے
تدنتو چالایا چھے

কাশ্মীরের পল্লীতে দুঃসাহসিক

বিভাগ

۲ حروف القران ۱۶۳ شنکها ۹ ذی القعده – چاٹگام

وکذی کادیر بهلے جنولیکا
مسلمان استری لوک وکذی دکدهو
هئے بران نیاگ کرے •
ستری لوک ئی یک پرکار
ردهو چهیلو بالے و چلے •
وکذی کاندیر شمئے ستری لوک نی
تار کهرے نیدرا جیئے چهیلو •

আমেরিকায় বিমান দুর্ঘটনা

৭জনের প্রান নাশ

چیکاگو

چیکاگو بیمان کهانی نے
یونائیٹد استیٹس ایئار
لائینیز یک کهانا جاتری باهی
بیمان پورت وبدرن کربار کالے
اما وکش شات چورنو بیچورنو
ائیے بهیدگے پڑے چهے •
بهلے رتذو یک شات جن
لوکیر بران هانی کهتے چهے •

ফেনীতে দুই ব্যক্তির কারাদণ্ড

فینی

منیندرو لال شین شرما و
نیونوش چندرو داش پرتیک
فینیز معکمار حاکیم کرتریک
بهارت رکها آئین ونوشارے
یک بتشر کرے شرم کارادنڈے
دنڈیتو هئیے چهین ضامین بنهدنو
سنهانے جوددهو بیروندهی
پروچار پترو چهرائیبار وبهاجوکے
تاهرا ریهاجوکتو هئے چهین

ভারতে বৃটিশ আশ্রয় প্রার্থী

بمبئے

رومانیان ریفیوجی کمیٹی
استهیر کرے چهین جے رومانیا
هتے آگتو جابتیکو بیرنیس ناری
و شیشو دیک کے هیتار استهیتو
بندی شیبیرے باس کرتو

www.pathagar.com

مہاڑاز نظم جکتو تفسیر (۰۷) (نجر)

দ্রষ্টব্যঃ – متقارب ছন্দে উর্দু পদ্যের ন্যায় ডান দিক হইতে পুরা লাইন পড়িবেন

پرکہا ہئے تاتے وبشو شبار	جے کیش آشے کی منے بھاب کار
সবার অবস্থা তাতে হয় পরীক্ষা	কার ভাব মনে কি আসে কিবে যে
شکھ و دوکھ ہئے شرن ربکے جار	منشو بلے بشبی ہکے نام تار
যার রবকে স্মরণ হয় দুখে ও সুখে	তার নাম হয় বিবে বলে মনুষ্য
برنگ لوکو تمرا بڑو ناشکرو	کرونا دتیم و رناہیر آدر
নাশোকর বড় তোমরা লোক বরং	আদর অনাথের ও এতিম করোনা
بلونا کیو کاکے یکٹو ککھن	جے ہے داؤ مسکین کے ودنودھن
কখন একটু কাক কেউ বলনা	ধন অন্ন মেছকিনকে দাও হে যে
پلے مال و میراث کارو ککھن	پڑے لوبھ بکھن کرو تا تکھن
কখন কারও মাল পেলে	তখন তা করো বক্ষণ লোভে পড়ে
تھکو ورتھو لوبھ انندے پڑے	جتو دن تھکے اریو آنتا دھڑے
পড়ে আনন্দে লোভে অর্থ থাকো	হতে আত্মা প্রিয় থাকে দিন যত
کبھوتا ندی و کبھو تا نکی	جے ایی رنگے ڈھنگرہے نا شبئی
নই তা কভু ও নই তা কভু	সবই তা রবে ঢঙ্গে রংগে এই যে
ہرے اشو چکرائے تمرا شنا	قیامت کے بھولے تھکو شربدا
সদা তোমরা চকুরাছে বিষ পড়ে	সর্বদা থাকো ভুলে কে
قیامت ارمبھو ہلے شرو ہکے	دیکھا دیبے ایشے نذروپ اہئے
হয় শুরু হলে আরম্ভ কেয়ামত	দ্বন্দ্ব নানারূপ এসে দিবে দেখা
ہلے کوکنے دھکھا و دھکی بھجے	شے دھکاکے شب چھنو بھنبو ہبے
তবে থাকা থাকা থাকবে হবে	হবে ভিন্ন ভিন্ন সব থাকাতে সে
اکاش و پاتا لئی دکھو جا بھبے	شمستو سرشٹی لی لپتو ہبے
ভবে যা দেখ পাতালই ও আকাশ	হবে লুপ্ত সৃষ্টিই সমস্ত
ہبے تار پرشت سرشٹی ابار	ہبے جیب و جنتور نوتن اکار
আবার সৃষ্টি সব পর তার হবে	আকার নূতন যন্তু ও জীব হবে
ہبے تائی بچار دبش شبار	دڑاے شبائی تو بیندے قطار
সবার দিবস বিচার তাই হবে	কাতার বেঁধে তো সবাই দাঁড়াবে

[illegible] (۸) ہمارا نظم جلتر تفسیر

দ্রষ্টব্য :— متقارب ছন্দে উর্দু পদ্যের ন্যায় ডান দিক হইতে পুরা লাইন পড়িবেন।

رہینا کبو کارو شنگے کٹھن	اُلدکو دھے شب داںتڑابے تکھن
ভাবেন সঙ্গে কারও কোন রবেনা	তখন দাঁড়াবে সব দেহে উজল
نبو رنگ و روپے ھبے شاج تار	ھٹاںتی ھبے بشـشر اُجل اکار
তার সাজ হবে রূপে রং নব	আকার উজ্জ্বল বিশ্বের হবে হঠাৎই
جے کبو دیکھے نائي ککھن تار اکار	اِمنئی اِشے پڑبے بشـشے بہار
আকার তার কখন নাই দেখে কেউ যে	বাহার বিশ্বে পড়বে এসে এমনই
وتبي اُجـجل اکارے اپنا نگار	تکھنئي دیکھابین پروردگار
যেথায় আপনা আকারে উজ্জ্বল অতি	পরওয়ার দেগা দেখাবেন তখনই
داںڑابین میدانے شب بینو ھے دل	ارو نادر شنگے فرشتہ شکل
দল বেঁধে সব ময়দানে দাঁড়াবে।	সকল সঙ্গে তাঁর আরও
دکھے تانکے آکی چکـکھے چیبے زان	دبل بھکتو کن تانکے دیکھے لین
আপন চেয়ে চক্ষে তাঁকে দেখে	লবেন দেখে তাঁকে ভক্তগন কেবল
کتو بھکتي کربین تانکے [illegible]	پکے تانکے نادرا منیرئی بتھاے
[illegible] তাঁকে করবেন ভক্তি কত	যেথায় মনেরই তাঁরা তাঁকে পেয়ে
کبھو اُشبینا تا کتھاے [illegible]	منیرئي بتھا تا منیرئی بدن
[illegible] কোথায় তা জানেনা কভু	যেমন মনেরই তা যেথা মনেরই
دکھا پابینا شے شیکي [illegible]	مگر جے وبشـشاش ھئے جمبنے
[illegible] সেই সে পাবেনা দেখা	জেনে হয় অবিশ্বাস যে মগর
اپن چکـکھے شب تاکے [illegible]	جہنمکے شموکھے انا ھبے
[illegible] তাকে সব চক্ষে আপন	হবে আনা সম্মুখে জাহান্নমকে
[illegible] بنوجوکے اللہکے بربے	بنشـشو دکھے تا دکھنئے اپن
স্মরণ করবে আল্লাহকে মনযোগে	আপন নিয়ে তা দেখে মনুষ্য
اھا مر جدی ارشے جدن ھتو	بلبے ھتئے دوکھے مرماھتو
হতো জীবন সে আর যদি মোর আহা	মর্মাহত দুঃখে হয়ে বলবে
شمکے تو ھبینا کبھو تار [illegible]	تبے تا کی کاجے تہکن اشبے نار
[illegible] তার কভু হবেনা সমর্থতো	তার আসবে থাকি কাজে কি তা তবে
[illegible] پھرے تا اشینا کلّے	شمکے تہکتے ھئے ورتو کرے شبار
একবার গলে জানেনা তা ফিরে	সবার করতে কর্ম তয় থাকতে সময়ে

হরফ সমস্যা

(নিরপেক্ষ আলোচনা)

-- দূরদর্শী

www.pathagar.com

(১) সম্প্রতি কিছুদিন হইতে একটি বিতর্ক চলিয়াছে এবং তার তীব্রতাও রফ্‌তা রফ্‌তা বাড়িয়া চলিয়াছে। বিতর্কের মজমুন্ এই যে,- বাংলা হরফের তরমীম করা হইবে, না তার বদলে আরবী অথবা ইংরাজী হরফ চালু করা হইবে। এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সলা করিবার জন্য গভীর এবং স্থির চিন্তা ও ভাবনার প্রয়োজন। ভাবপ্রবণতা—চাই কি সেটা মজহাবী রকমেরই হউক, যেমন আরবী হরফের তরফদারদের মধ্যে দেখা যায় অথবা তমদ্দুনী বা তাহজিবী রকমের ভাবপ্রবণতাই হউক যার আশ্রয় নিয়া থাকেন বর্ত্তমান বাংলা হরফের সমর্থকগণ—এর কোনটাই সুস্পষ্ট চিন্তা ও সুযুক্তির অনুকূল নয়। একদল পীর ও মৌলানা সাহেবানের তায়ীদ এবং অপর দল অর্ব্বাচীন যুবকদের সমর্থন হাসেল করিয়া থাকেন। কিন্তু এ দু'য়ের কোনটাই সহীহ্ রায় কায়েম করার কাজে আমাদের সাহায্য করিবে না। এইসব অপ্রাসঙ্গিক জিনিষগুলি বিবেচনার বিষয়গুলিকে ঘোরালো করিয়া তোলে মাত্র। সকল প্রকার ভাবপ্রবণতা এড়াইয়া বিষয়টিকে ধীর ও স্থিরভাবে বিবেচনা করা, ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে যাহা বলিবার আছে তার গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করা, ইহার সুবিধা ও অসুবিধাগুলির পরিমাণ নির্ণয় করা, পাকিস্তানের এবং বিশেষভাবে পূর্ব্ব বাংলার, বৃহত্তম স্বার্থের খাতিরে আমাদের পক্ষে কোন পথ গ্রহণ করা উচিত তার ফয়সলা করা বর্ত্তমান সময়ের অতি বড় চাহিদা।

যে সব বে-বুনিয়াদ ভয় ও গলৎ ফহ্‌মীর জাল বিবেচনার প্রধান বিষয়গুলির চারিধারে বুনা হইয়াছে, সেগুলিকে ছিন্ন করিতে পারিলে চিন্তাধারা পরিষ্কার হইবে।

www.pathagar.com

(২) পয়লা কথা এই, কতক লোকের ধারণা বাংলা ভাষাকে আরবী হরফে লেখার প্রয়াস উর্দুকে পূর্ব বাংলাবাসীদের উপর চাপানোর নামান্তর মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে কথাটি সঙ্গত মনে হয়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, কথাটি একেবারে ফাঁকা। ভুলিলে চলিবেনা যে বাংলা ভাষায় আরবী হরফ এস্তেমালের ধারণাটি কোন বিদেশীর চিন্তা-প্রসূত নয় ('বিদেশী' মানে অ-পাকিস্তান মুসলিম—আমাদের বদ্‌কিসমতির দরুণ এই অর্থে আজকাল শব্দটির এস্তেমাল শুরু হইয়াছে) বা পার্টিশান পরবর্তীকালের কোন ভুঁইফোড় প্ল্যান নয়। বহু বৎসর পূর্বে এ খেয়ালটি দানা বাঁধিয়াছিল পূর্ব বাংলারই একজন মহৎ এবং মোত্তাকী সন্তানের মনে। চাটগাঁয়ের মৌলানা জুলফিকার আলী সাহেব ইহার অগ্রদূত। তিনি একজন খোদাভক্ত এবং বিজ্ঞ লোক এবং সায়েমুদ্দাহার (নিষিদ্ধ দিনগুলি ছাড়া তিনি সারা বৎসর রোজা রাখেন)। কিরূপে রসূলে করীম (দঃ) স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দান করিয়া এ কাজে অগ্রণী হইবার ভার তাঁর উপর সোপর্দ করেন, যখন তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করেন তখন স্বাভাবিক খুলুস এবং ভাবাবেগে তাঁর অশ্রুর ঝরণায় বান ডাকে। সে অশ্রু অতি পাষাণ হৃদয়কেও বিগলিত করে। সেইদিন হইতে আরবী হরফকে বাংলা ভাষায় চালু করার কাজকে তিনি তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মিশন মনে করিয়াছেন এবং ইহার জন্য নিজের জীবনকে ওয়াক্‌ফ করিয়াছেন। তিনি আরবী হরফে অনেক বইপুস্তকও লিখিয়ানে এবং তার বেশীর ভাগ বিনা পয়সায় তক্‌সীম করিয়াছেন। দারিদ্র্য সত্ত্বেও তিনি প্রায় বিশ বৎসর যাবত আরবী হরফে একখানা বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা চালাইয়া আসিতেছেন। এইরূপ দৃঢ় অধ্যবসায় ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা কেবল ইসলামের প্রাথমিক যুগের কথা মনে করাইয়া দেয় এবং আজকাল আমাদের মধ্যে অতি অল্পই দেখা যায়। অতঃপর তাঁর এই স্কীমের প্রতি মাশ্‌রেকী পাকিস্তান ওলামায়ে ইসলামের নজর পড়ে। তাঁরা সর্বান্তঃকরণে ইহার সমর্থন এবং সারপারাস্তি করিয়াছেন। কাজে কাজেই স্কীমটি খাঁটি দেশী, বিদেশীর কল্পনাপ্রসূত নয়। যদি বলা যায় যে কোন বিদেশী ইহার অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছেন, তবে সে বিদেশী আর কেউ নন, স্বয়ং মানবশ্রেষ্ঠ রসূলে করীম (দঃ) যিনি সে সুদূর 'বিদ্রেশ মক্কায়' পয়দায়েস লাভ করিয়াছিলেন এবং তার চাইতেও দূরে 'বিদেশ মদিনায়' অফাত পাইয়াছিলেন। 'বিদেশীই' ত বটেন তিনি, কিন্তু পাকিস্তানে তথা সমগ্র মুসলিম জাহানে এমন কোন মুসলিম আছে যে সে 'বিদেশীর' নামকে তার সকল প্রিয়জন অপেক্ষা প্রিয়তম মনে না করেন এবং যাঁর খাতিরে সে তার জান কোরবান করিতে প্রস্তুত নয়? বস্তুতঃ

www.pathagar.com

পাকিস্তানের জন্মই এই জন্য যাহাতে নবী-করীমের (দঃ) প্রদর্শিত জীবনযাত্রা প্রণালী অনুসরণ করা যায়। লেখকের আরজ, অপাকিস্তান-জ মুসলমানদের সম্পর্কে ভবিষ্যতে 'বিদেশী' শব্দটির প্রয়োগের বেলায় যেন ইহার অন্তর্নিহিত ঘৃণিত ও অনৈসলামিক ভাবপ্রকাশক ইঙ্গিতের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। মুসলমানের অভিধানে বিদেশী কেবল সেই-ই যে ইসলামের আওতার বাহিরে—আর কেহই বিদেশী নয়।

অপরপক্ষে হরফের পরিবর্ত্তন কোন ভাষাকে হত্যা করিতে পারে না। কে না জানে যে উর্দ্দুর উৎপত্তি হইয়াছে উত্তর ভারতের নিজস্ব প্রাকৃত ও বৃজ ভাষা হইতে। মৌলিক দেবনাগরীর পরিবর্ত্তে মুসলমানেরা উহাকে ফারসী হরফে লিখিতে শুরু করে। ভাষাকে কতল করিবার বদলে এই নতুন হরফ তাহাকে নতুন জীবন ও শক্তি দান করিল। নতুন পোষাকে সজ্জিত ভাষাটি হইল অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ, মার্জ্জিত এবং অধিকতর প্রকাশ ক্ষমতাসম্পন্ন। ভাষার কাঠামো যা ছিল তাই রইল, কেবল আরবী ফারসী শব্দের একটি পরত তাহাতে যুক্ত হইয়া ভাষাটিকে ইসলামী তমুদ্দুনের পটভূমিকায় দাঁড় করাইল।

ফারসী ভাষার কথাই ধরা হউক। আরবী হরফের একটি নতুন সংস্করণ (নাস্তালিক) তাহাতে ব্যবহার করার ফলে ভাষার মৃত্যু হইল না, বরং তাহার বিকাশ ও বর্দ্ধনের সহায়তা হইল। হরফ বদলের পর অনেক শতাব্দী গত হইয়াছে, কিন্তু আজও ফারসী আরবী হইতে যতটা স্বতন্ত্র উর্দু ফারসী হইতে সমভাবে স্বতন্ত্র, মৃত্যুর কথা দূরে থাকুক। পস্তু, সিন্ধি, মালয়ান এবং ইন্দোনেশিয়ান ভাষাগুলি সম্পর্কেও একথাটি প্রযোজ্য। যদি বাংলা ভাষাকে আরবী হরফে লেখা হয় তবে উপরোক্ত ভাষাগুলির ন্যায় বাংলা যে আলাদা ভাষা হিসাবে অনুরূপভাবে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হইবে না, এ ধারণার পিছনে কোন সদ্‌যুক্তি নাই। প্রায় প্রত্যেকটি ভাষাকেই অন্য কোন হরফে লেখা সম্ভব, অথচ তার আলাদা হাছ্‌তি বা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার পথে কোন বাধা হয় না। ভাষা এবং হরফ, ইহারা পরস্পর আলাদা জিনিষ। ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে-বেশীর ভাগ তাদের হরফ বদল করিয়াছে এবং তাদের আলাদা হাছ্‌তীও বজায় রাখিয়াছে। বাংলার সমান বিকশিত ও সমৃদ্ধ কোন ভাষাকে পরিবর্তনের ফলে সত্ব হারাইতে হইয়াছে এমন কোন নজীর নাই। এ দিক হইতে যে কোনরূপ আশঙ্কাই সম্পূর্ণ অমূলক। মজার কথা এই যে, যারা উর্দ্দুকে পূর্ব্ব বাংলার সার্বজনীন ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিতে চান তাঁরা "বাংলার জন্য আরবী হরফের ব্যবহার"এর পক্ষপাতী নন—এই জন্য যে তাহাতে বাংলা ভাষা নতুন জীবনলাভ

www.pathagar.com

করিবে, মরিবে না। তাঁদের মতে বর্তমান হরফে বাংলার লিখন চলিত থাকিলে তাহার মরণ অনিবার্য। সুতরাং এ কথাটি বুঝিতে কষ্ট হওয়া উচিত নয় যে, এ আন্দোলনটির পিছনে কোন কুমতলব থাকিতে পারে না। পূর্ব বাংলার বহু সৎ, মহৎ ও কৃতী সন্তান, যাঁহাদের সততা ও মহত্বে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই, এই আন্দোলনের অগ্রনায়ক। তাঁহারা দূরদর্শী কি না বা তাঁদের মত ভ্রমাত্মক কি সত্য, ভবিষ্যত কালই তাহা নির্ণয় করিবে। এ কথা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য যে পূর্ব বাংলার জন্য তাঁদের দরদ কারও চাইতে কম নয়। সুতরাং পক্ষপাতশূন্য মনে তাঁদের প্রস্তাবটির দোষগুণ বিচার করাই সবার কর্ত্তব্য।

(৩) আরও একটি আশঙ্কার কথা শুনা যায় যে "যদি আরবী হরফের প্রবর্তন হয় তবে রাতারাতি একটি ইনকেলাব আসিয়া পড়িবে। এর জন্যে, যাঁরা এই হরফের সঙ্গে পরিচিত নন তাঁদের চাকরী-বাকরী ছুটিয়া যাইবে, অথবা রাতারাতি এই নূতন হরফে বাংলা লেখার সামর্থ্য অর্জন করিবার হাঙ্গামা তাঁদের পোয়াইতে হইবে।" কোন সুস্থবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি এরূপ অকস্মাৎ এবং জবরদস্তিমূলক পরিবর্তন কামনা করিতে পারে না। কেহ কখনও এমন প্রস্তাব মনে করে নাই যে যাঁরা বাংলা হরফের মারফতে শিক্ষা পাইয়াছেন এবং আরবী হরফের সাথে পরিচিত নন, তাঁদের আরবী তিনমাসের মধ্যে দেবনাগরী শিখিতে বাধ্য করিয়াছেন—অন্যথায় তাঁহাদের স্থায়ী চাকরীও থাকিবে না।) কিন্তু আমাদের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য এই যে, যদি আরবী হরফ প্রবর্তন স্থির করা হয় তবে তাহা ক্রমশঃ কাজে পরিণত হইবে। কিছুদিনের জন্য উভয় হরফই ইচ্ছাধীন থাকিবে এবং যাহারা আরবী হরফে বাংলা লিখিতে ইচ্ছা করিবে, কোন আইনের বাধ্যবাধকতার দ্বারা তাহাদিগকে বাধা দেওয়া হইবে না, অথচ বর্তমানে সেরূপ বাধা আছে। মেছাল হিসাবে ধরুন, যেমন আরবী হরফে লিখিত কোন বাংলা দরখাস্ত আদালতে দাখিল করা যায় না, কিম্বা কোন ছাত্র পরীক্ষার খাতায় আরবী হরফের ব্যবহার করিতে পারে না। এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না যে যিনি ইচ্ছা করেন, আরবী হরফ ব্যবহার করিবার অধিকার তাঁর ঠিক অতখানিই আছে যতখানি বাংলা হরফ ব্যবহার করিবার এখ্‌তেয়ার রহিয়াছে। এই সুবিধাটুকু বিশেষ সহায়তা করিবে আমাদের হাজার হাজার মৌলভী মৌলানাদের, যাঁহারা দারছে-নিজামীর মারফতে তালিমপ্রাপ্ত এবং বাংলা হরফের সাথে বিশেষ পরিচিত নন। বয়স্ক নিরক্ষর এবং প্রাইমারী স্কুলের নতুন শিক্ষার্থীরা আরবী হরফের মধ্যস্থতায় শিক্ষা আরম্ভ করিতে পারে। এভাবে ১০/১৫ বৎসর কালের মধ্যে

www.pathagar.com

অবস্থার জরুরী পরিবর্ত্তনাদি সাধিত হইবে এবং সমাজে একটি নতুন তব্‌কা বা পর্য্যায়ের সৃষ্টি হইবে যাদের পক্ষে আরবী হরফে বাংলা লিখন ও পঠন অতটা সহজ হইবে—যতটা সহজ উর্দ্দু ভাষাভাষীদের পক্ষে উর্দ্দু পঠন ও লিখন। চাহিদা অনুসারে আরবী হরফে লেখা বাংলা বইয়ের সরবরাহ শুরু হইবে এবং যতই পাঠকের সংখ্যা বাড়িবে বইয়ের সংখ্যাও ক্রমেই বাড়িবে। আস্তে আস্তে বাংলা সাহিত্যের Classical পুরাতন বইগুলির আরবী হরফে লিখিত সংস্করণ বাহির হইতে আরম্ভ হইবে—বিশেষতঃ ঐ সমস্ত বই যাহা মুসলিম রুচিসম্মত। বাংলা সাহিত্যের কেবল ঐ অংশ মৃতকাষ্ঠের (dead wood) দশা প্রাপ্ত হইবে, যাদের মুসলিমবিরোধী উপকরণের দরুণ এ দশা প্রাপ্ত হওয়াই উচিত। হরফের পরিবর্ত্তন হউক বা না হউক, পূর্ব্ববাংলার সে জাতীয় সাহিত্যের লয়প্রাপ্তিই ইহার ভাগ্যের অখণ্ডনীয় লিখন।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাতে আশাকরি এ কথাটি খোলাছা হইয়াছে যে হরফের পরিবর্ত্তন কেউ জবরদস্তি করিয়া কারো উপরে চাপাইতে চায় না। কাহারও এরূপ ধারণা থাকিলেও তাহা কাজে পরিণত হইতে পারে না, কারণ তাহা অবাস্তব। ডাক্তার শহীদুল্লা, মিঃ আবুল হাসানাত ইসমাইল প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে নিয়ে একটি শক্তিশালী এবং প্রতিনিধিস্থানীয় কমিটি এ প্রশ্নের বিচারে মসগুল আছেন এবং তাঁরা যথাসময়ে তাঁদের সুপারিশ গভর্ণমেন্টের কাছে পেশ করিবেন। তাঁরা কি সুপারিশ করেন, তাহা আমাদের সর্ব্বপ্রথম দেখা দরকার। যদি কখনও গভর্ণমেন্ট হঠাৎ আমাদের উপর এ পরিবর্ত্তনটি চাপাইতে চান তবেই আমাদের সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সময় আসিবে। বর্ত্তমানে এ বিষয়ে মাতামাতি করিয়া আমাদের সময় ও জীবনী-শক্তি ক্ষয় করার কোন কারণ দাঁড়ায় নাই। ইহা অপেক্ষাও জরুরী কথা এই যে এই কাল্পনিক জিনিষটির খেলাফে প্রতিবাদ করিবার জন্য সভাসমিতি ও মিছিল ইত্যাদির আয়োজনে আমাদের ছাত্রসমাজের সময় এবং জীবনী-শক্তি ব্যয় কোনক্রমেই কল্যাণকর নয়।

(৪) এ সম্পর্কে আর একটি আশঙ্কার উল্লেখ করিতে হয়। "হরফের পরিবর্ত্তনের দরুণ বইয়ের কাট্‌তির অভাবে বর্তমান বাংলা লেখকদের মধ্যে অনেকেরই নোকছান হইবে।" পরিবর্ত্তনটি ক্রমশঃই হইবে ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং কিছুকালের জন্য বর্ত্তমান হরফে বাংলা পাঠকের সংখ্যা বিশেষ কমিবে না। অন্যপক্ষে আরবী হরফের মারফতে শিক্ষা আরম্ভ হইবে কেবল নিরক্ষরদেরই—যারা বাংলা হরফের সাথেও পরিচিত নয়। কাজেই হঠাৎ বাংলা বইয়ের কাট্‌তি কেন

www.pathagar.com

কমিবে এবং এই আশঙ্কার কি ভিত্তি আছে, তাহা বোঝা মুসকিল। তবে ভবিষ্যতের বিবেচনায় (এবং দীর্ঘমেয়াদী গুরুত্বসম্পন্ন স্কীমের বিবেচনায় ভবিষ্যৎ বর্তমান অপেক্ষা বেশী দরকারী) এ কথাটি ভুলিলে চলিবে না যে, বইয়ের কাটতি নির্ভর করিবে (অপরাপর জিনিষের মধ্যে) বেশীর ভাগে তার বিষয়-বস্তুর উপর। সুতরাং সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এই, পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ বই-পুস্তকাদির বিষয়বস্তু ও ভাবধারা কিরূপ হইবে? একবাক্যে এবং দ্বিধা-হীনভাবে সবাই ইহা স্বীকার করিবেন যে, যেহেতু একটা সুস্পষ্ট মতবাদ ও আলাদা প্রাণশক্তির ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সুতরাং আমাদের লেখকগণও স্বাভাবিকভাবে সে মতবাদ ও ভাবধারার অনুবর্তিতায় সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন। হিন্দুভারতের চোখে পাকিস্তান এবং পাকিস্তান বলিলে যাহা কিছু বোঝায় তৎসমুদয়ই বিষবৎ। অধিকন্তু, হিন্দু প্রাধান্যের দরুণ এতদিন যে সমস্ত মুসলমানী শব্দ অবহেলিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছিল, সেগুলি এখন বহুলভাবে আমাদের সাধু বাংলায় এস্তেমাল করা হইবে। বাস্তবিকপক্ষে এই ধারাটি ইতিপূর্বেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাদের ভাষা কালক্রমে পশ্চিমবঙ্গের ভাষা হইতে অনেকখানি পৃথক হইতে বাধ্য। এসব কারণে মুসলমানী বাংলায় এবং পাকিস্তানী বাংলায় এবং পাকিস্তানী ভাবধারায় লিখিত বইয়ের কাটতি পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে ক্রমেই কমিতে বাধ্য—এমনকি হরফের পরিবর্তন যদি নাও হয়। বইয়ের কাটতির জন্য আমাদের লেখকদের নির্ভর করিতে হইবে কেবলমাত্র পাকিস্তানী পাঠকসমাজের উপর। বাংলা বর্ত্তমান হরফে লিখিত হইতে থাকিলে বাংলা বইয়ের বাজার প্রায় সম্পূর্ণরূপে পূর্ব-বঙ্গের সীমারেখার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু হরফের পরিবর্ত্তন পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য বাংলা শিক্ষা সহজ করিয়া দিবে। তারা বাংলার প্রতি অধিকতর অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছে এবং হরফ পরিবর্ত্তনের সুবিধাটুকু পাইলে অধিকতর লোক অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে বাংলা শিক্ষা করিতে পারিবে।

(৫) বিরোধীদের মতে বাস্তবক্ষেত্রে ইহা ঘটিবে না। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা বলিয়াছেন—হরফের ঐক্য থাকা সত্ত্বেও একজন আরবের পক্ষে ফারসী বা উর্দুর একটি অনুচ্ছেদ অবোধ্য, যেমন ইংরেজী জানা লোকের কাছে জার্ম্মান বা ফরাসী ভাষা। এই যুক্তিতে তাঁহারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, আরবী হরফে লিখিলেও বাংলা উর্দু ভাষার পণ্ডিতদের নিকট অবোধ্যই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু তাহাদের যুক্তিতে কতকগুলি গলদ রহিয়াছে। কেহই এ দাবী পেশ করেন নাই যে, কেবলমাত্র হরফ একরকম হইলেই অজানা ভাষা বোধগম্য হয়, দাবী শুধু এইটুকুই যে

www.pathagar.com

যে (কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি একথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না) একরকম হরফ অপেক্ষাকৃত সহজে শিক্ষার্থীকে অপর ভাষা শিক্ষায় সাহায্য করে। এতদুপরি একরকম হরফের সাথে যদি শিক্ষণীয় ভাষায় এমন আরও কতিপয় factor (বিষয় বা মাল-মসলা সাধারণ থাকে, যাহা শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায়ও রহিয়াছে তবে ভাষাটির শিক্ষা সেই সাধারণ বিষয় (common factor) গুলির অনুপাতে অধিকতর সহজ হয়। আরবী ভাষার গঠনপ্রণালী মূলতঃ ফারসী এবং উর্দু হইতে আলাদা। কিন্তু যেহেতু উর্দু ফারসী ও আরবীতে হরফ একরকম, অনেকগুলি শব্দ একরকম এবং ভাবধারায়ও সামঞ্জস্য রহিয়াছে, সেজন্য একজন উর্দু ফারসী জানা লোক যত সহজে আরবী ভাষা শিখিতে পারে এবং যত নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করিতে পারে, ধরুন একজন জার্মান বা ফরাসী দেশীয় লোকের পক্ষে তত সহজে তাহা শিক্ষা করা সম্ভব হয় না। প্রতিপক্ষ বলিয়া থাকেন, মাতৃভাষা বাংলা হইলেও পূর্ব্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা আরবী ফারসী জানা ওলামার সংখ্যা ত কম নয়। স্বীকার করি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, পূর্ব-বাংলার ওলামাদের কয়জন বাংলা হরফ সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত? তাঁদের অনেকেই এক্ষেত্রে একদম মাসুম। বর্ত্তমান কালে তাঁরা বাংলার সাথে খানিকটা পরিচিত হইলেও অতীতে তাঁরা বাংলায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। বর্তমান সংস্কৃত-বহুল বাংলায় তাঁদের জ্ঞান অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর একথা সবাই অকপটে স্বীকার করিবেন। হাঁ, মানি, কতক exception বা ব্যতিক্রমও রহিয়াছে; কিন্তু সে ব্যতিক্রম (exception) গুলি সাধারণ সূত্রটিকে সপ্রমাণিত করে। 'উর্দু ও বাংলা,' এ দু'য়ের মধ্যে সমতা অনেক বেশী রহিয়াছে। 'আরবী ও উর্দু' কিংবা 'ফারসী ও উর্দু' ভাষাযুগলের তুলনায় উর্দুতে আরবী ও ফারসী শব্দ যে পরিমাণ আছে, মুসলমানী বাংলায় তার চাইতে কিছুই কম নয়, সম্ভবতঃ বেশীই হইবে; সুতরাং এই শব্দগুলি উভয় ভাষায় সমভাবে ব্যবহৃত হয়। এই সম-শব্দসমষ্টির বেশীর ভাগ বিশেষ্য ও বিশেষণ। বাংলা হরফ এই শব্দগুলির জন্য অনেক ক্ষেত্রে অনুপযোগী হওয়ার দরুণ তাদের উচ্চারণ এত বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে তাদের চেনা ভার হইয়া যায়। কিন্তু যদি আরবী হরফের প্রবর্ত্তন হয়, তবে এই শব্দ-সমষ্টি তাদের নিজস্ব রূপ ও ধ্বনি পুনঃ প্রাপ্ত হইবে এবং বাংলা ও উর্দু এই উভয় ভাষায় তাদের লিখনপ্রণালী এক হইয়া যাইবে। ধরুন وضو বাংলায় 'অজু' আকার ধারণ করে, কিন্তু উর্দুতে তার বানান ও উচ্চারণ বহাল থাকে। এতদ্ভিন্ন একই ভাষা-গোত্র হইতে উর্দু ও বাংলা উভয়ের উৎপত্তি এবং সে জন্য তাদের গঠনমূলক সাদৃশ্যও অধিক। অনেকগুলি ক্রিয়াপদ

www.pathagar.com

উভয়ের মধ্যে common (সাধারণ) যদিও সামান্য ব্যবহারিক তফাৎ দেখা যায়। উদাহরণস্থলে 'খাওয়া', 'যাওয়া', 'করা', উর্দুতে 'খানা', 'যানা', 'কারনা', রূপ ধারণ করে—তফাৎ কেবল অন্তের। আরবী হরফে লিখিত মুসলমানী বাংলার একটি অনুচ্ছেদের সাদৃশ্য উর্দুর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ যে কেবল শেষোক্ত ভাষায় জ্ঞানসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তির পক্ষে অনুচ্ছেদটির মোটামুটি অর্থ গ্রহণ কিছুই শক্ত হইবে না। ভাষাদ্বয়ের কি কি বিশেষত্ব এবং তাদের মধ্যে কোথাও কি তফাৎ, এ সম্বন্ধে কয়েকটি মাত্র মোখ্‌তসর পাঠ দ্বারা একজন উর্দু ভাষাভাষীকে অল্প সময়ের মধ্যে বাংলার চলনসই জ্ঞান দান করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নের ছত্রগুলি উপস্থিত করা গেল ঃ—

ابّاجان - آداب - اللہ فضلے اماجان ئر صحت آجکل بھالو - اے بار
فصل و خوب بھالو ہوئیچھے - دھان ئر دام کم ہوئیچھے - بازارے
بہت رقم ئر جنس اٹھیچھے - آمی آج ڈھاکہ شہرے جائیبو - ایکٹی
سلائی مشین درکار ابّو کیسے تشریف انیبین ؟

বাংলায় 'ব' না জানা অবস্থায়ও একজন উর্দু জানা লোকের পক্ষে এটুকু বোঝা শক্ত হইবে না যে, কোন ছেলে তার আব্বার কাছে এই চিঠিখানা লিখিয়া জানাইতে চাহিয়াছে যে তার আম্মার শরীর ভাল, এবারে ফসল ভাল হইয়াছে, ধানের দাম কমিয়াছে, বাজারে অনেক রকম জিনিষ উঠে। চিঠিতে তার ঢাকা যাওয়া এবং একটি সেলাই কল খরিদ করিবার কথাও বলা হইয়াছে।

কয়েকটি মাত্র পাঠের সাহায্যে শিক্ষার্থীকে বলা যাইতে পারে যে   অথবা অর্থে of এর (সম্বন্ধ)   বর্তমান কাল বুঝায়;   ভবিষ্যত কাল সূচক এবং — ভাবী কাল সূচক ক্রিয়াপদে সম্মানার্থকরূপে ব্যবহার হয়। দৈনিক ২/৩ সপ্তাহ শিক্ষা দিলে একজন মাঝামাঝি রকমের মেধাসম্পন্ন উর্দু জানা লোকের পক্ষে আরবী হরফে লেখা মুসলমানী বাংলায় চলনসই রকম জ্ঞান লাভ করা খুবই সম্ভব, হাতে-কলমে ইহা দেখাইয়া দেওয়া যায়। অথচ বাংলা অক্ষরের মারফতে ঐটুকু জ্ঞান হাসিল করিতে মাসের পর মাস চলিয়া যাইবে। আরবী হরফের দৌলতে উর্দু ভাষাভাষীদের বাংলা শিক্ষার পথ সুগম হইলে বাংলা লেখকগণের বইয়ের কাট্‌তি বাড়িবার সম্ভাবনা, যাহা বর্ত্তমান হরফকে আঁকড়িয়া থাকিলে কিছুতেই হইতে পারে না।

বাংলা হরফের তুলনায় আরবী হরফগুলি নিকৃষ্ট এবং অনেক দোষত্রুটীপূর্ণ, এ জাতীয় উদ্ভট কথার অবতারণা করিয়া একটি গোলকধাঁধার সৃষ্টি করা হইয়াছে। এ

www.pathagar.com

সম্বন্ধে একটি লেখা বিশেষভাবে প্রচারলাভ করিয়াছে। লেখাটি আপাত দৃষ্টিতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এ কথাটির সার্থকতা এই দিক থেকে যে, উর্দ্দু এবং বাংলার মামুলী রকমের জ্ঞানও যাদের আছে তিনিও বুঝিতে পারেন , লেখকের যুক্তিগুলি গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধানের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। পাণ্ডিত্য জাহির করিতে গিয়া লেখক কতক মারাত্মক গলতি করিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তার যুক্তি গোনাহের সীমায় আসিয়া দাঁড়ায়। তবে রক্ষা যে তাঁর ভ্রমগুলি বেশ কৌতুকাবহ হইয়াছে। বলিহারি, লেখকের অজ্ঞতা ও অসম-সাহসিকতা। তিনি বলেন, আরবী হরফে خدا বাংলার 'খোদা' (খনন করা) 'খেদা' (তাড়ান অর্থে) এবং 'খাদা' (জমির মাপ অর্থে) শব্দ ত্রয়ের সঙ্গে মিশিয়া বিভ্রাট ঘটাইতে পারে। একজন নবীন শিক্ষার্থীর পক্ষেও এটা বোঝা শক্ত নয় যে খনন করা অর্থে বানান হইবে کھودنا, তাড়ান অর্থে বানান হইবে کھیدا এবং জমির মাপ সূচক শব্দটির বানান হইবে کھادا। সুতরাং গোলমালের ত কোন কারণ দেখা যায় না। کش শব্দটিকে তিনি আর একটি উদাহরণস্থলে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁর মতে বাংলার কলস, ক্লেশ ও ক্লাশ শব্দ-ত্রয়ের সঙ্গে کش শব্দটি গোল পাকাইয়া তুলিবে। কিন্তু বানানগুলি যথাক্রমে کلس . کلیش এবং کلاس — হইবে—গোল-পাকানোর কোন কারণ নাই। লেখক একটি অদ্ভুত কথা এই বলিয়াছেন যে, খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ, বাংলার মহাপ্রাণ অক্ষরগুলির জন্য আরবীতে নূতন হরফ জুড়িতে হইবে, যেমন উর্দ্দুতে ٹ, ڈ, ڑ ইত্যাদি জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। উর্দ্দুর সঙ্গে যৎসামান্য পরিচয় যার হইয়াছে তিনি সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, উপরোক্ত ধ্বনিগুলি প্রকাশের জন্য ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই অবলম্বন করা হইয়াছে। بھا، پھا، تھا، ٹھا، جھا، چھا، دھا، ڈھا، کھا، گھا ইত্যাকার বানান বা অক্ষর উপরোক্ত ধ্বনিগুলি প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। প্রকৃতপক্ষে কেবল একটি বিশেষ ধ্বনি (অ) ছাড়া উর্দ্দুতে বাংলার সব ধ্বনিগুলি প্রকাশ হয়। এই বিশেষ ধ্বনিটির জন্য সঙ্কেত আবিষ্কার করিলেই যথেষ্ট হইবে।

একজন সরলচিত্ত প্রফেসার সাহেব আরবী, বাংলা ও ইংরাজী অক্ষরমালার আপেক্ষিক লিখন-দ্রুতি ও পঠন সুবিধা বিষয়ে কিছুটা এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করিয়া এই সত্যে উপনীত হইয়াছেন যে, এইসব বিবেচনায় আরবী বর্ণমালার স্থান সর্ব্বনিম্নে। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন বাংলো বর্ণমালার তরমীম হওয়া দরকার এবং উর্দ্দুতে রোমান বা ইংরোজী অক্ষর প্রচলন বাঞ্ছনীয় ; অবশ্য কোরাণ শরীফ আরবী হরফেই লিখিত হইতে থাকিবে। তাঁর রায় অনুসারে প্রত্যেক বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানের তিনটি

www.pathagar.com

আলাদা বর্ণমালা লিখিতে হইবে—কোরাণ শরীফের জন্য আরবী, মাতৃভাষার জন্য বাংলা এবং রাষ্ট্রভাষা উর্দ্দুর জন্য ইংরাজী বর্ণমালা। কিন্তু আরবী হরফ প্রবর্ত্তনের গোড়ার কথাগুলির একটি বড় কথা এই যে, এই ত্রিবিধ শিক্ষা একটি মাত্র বর্ণমালার সাহায্যে চলিতে পারিবে।

প্রফেসার সাহেব ভ্রমপূর্ণ ভিত্তির উপর তাঁর গবেষণা চালাইয়াছেন। বাংলার পরিবর্তে আরবী হরফের প্রস্তাব সম্পর্কে কেউ আজ পর্য্যন্ত যুক্তি হিসাবে একথা বলে নাই যে বাংলা অপেক্ষা আরবী হরফের পঠন সহজ। প্রস্তাবের সার্থকতা পরে বিবেচিত হইবে। কিন্তু মনে হয় আরবী হরফের বিরোধীদের সর্ব্বপ্রধান যুক্তি হইল উভয় বর্ণমালার আপেক্ষিক পঠন সুবিধা। উল্লিখিত লেখকদ্বয়ের গানের এইটাই হইল সর্ব্বপ্রধান সুর। বাংলা বর্ণমালার স্বরচিহ্নগুলিও আলাদা বর্ণবিশেষ (যেমন উ স্থানে ু) এবং এরা সর্ব অবস্থায় প্রকাশিত হয় ; অথচ আরবী বর্ণমালায় হ্রস্ব স্বরগুলি স্বরচিহ্ন দ্বারা সূচিত হয় এবং অনেকক্ষেত্রে সে স্বরচিহ্নগুলি অপ্রকাশিত থাকে। দুই বর্ণমালার এই প্রভেদটাকে কেন্দ্র করিয়া যত গোলমালের সৃষ্টি। অন্যপক্ষে আরবী বর্ণ প্রকরণে দীর্ঘস্বরগুলি বাংলার মতনই আলাদা বর্ণদ্বারা প্রকাশিত হয় এবং বুনিয়াদি সত্যটুকু সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রথমোক্ত লেখক সাহেবকে হাস্যকর ভুলভ্রান্তির পাঁকে নামাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অধিকাংশ আরবী ব্যঞ্জনবর্ণের ছোট আকারও রহিয়াছে এবং যখন বিভিন্ন হরফকে শব্দের ভিতরে যুক্তভাবে ব্যবহার করা হয়, তখন সেই আকার ব্যবহার করা হয়। এই বিশেষত্বগুলি একাধারে আরবী বর্ণমালার দোষ এবং গুণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এই বিশেষত্বগুলিই আরবী বর্ণমালার লিখন-প্রণালীতে Short hand ও Long hand-এর চমৎকার সমন্বয় সম্ভব করিয়াছে। এ ব্যবস্থার দরুণ সময় ও স্থানের যে বিস্তর ব্যয়সঙ্কোচ হয়, তাহা স্বতঃপ্রকাশিত। আরবী হরফে একটি অনুচ্ছেদ লিখিতে যত সময় ও স্থান লাগিবে, বাংলা বা রোমান হরফে তার অনুলিপিতে কমপক্ষে দ্বিগুণ সময় ও স্থান ব্যয় হইবে। এই সঙ্কোচ সাধন প্রথার আওতায় পড়িয়া পঠন সুবিধা খানিকটা খর্ব্ব হয় সত্য, তবে তাহা কেবল যে পাঠক ভাষার সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত নন তাঁর বেলায়ই খাটে। নিজের মাতৃভাষা লিখিতে বা পড়িতে কাহাকেও বেগ পাইতে হয় না—চাই কি তার মাতৃভাষা আরবী হরফেই লেখা হউক কিম্বা অন্য যে কোন বর্ণমালায় লিপিবদ্ধ করা হউক। আর যাই বলা হউক, পূর্ব্ব বাংলা ছাড়া মুসলিম জাহানের প্রায় সব দেশেই কোটি কোটি লোক তাদের মাতৃভাষায় আরবী অক্ষরের ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু তাদের কেউ কখনও আরবী

www.pathagar.com

হরফের পঠন সুবিধার স্বল্পতার দরুণ কোন মুসকিলে পড়িয়াছে, এ কথাও কখনও শোনা যায় নাই।

কায়রোর কোন ভাষা সংস্কার কমিটির কার্য্যবিবরণী হইতে কতক উদ্ধৃতাংশ হইতে প্রথমোক্ত লেখক মহোদয় এ কথা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, মিশরবাসীরা আরবী বর্ণমালা লইয়া ভারী মুসকিলে পড়িয়াছে এবং তাহারা এ বর্ণমালাকে পরিত্যাগ করিতে চায়। এমন কি কেউ নাকি রোমান হরফের শরণ নিবারও পক্ষপাতি। তাঁর যুক্তির ধারা এই ; যদি আরবী ভাষাভাষীরাই আরবী বর্ণমালার প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে ভূমধ্যসাগরে ছুঁড়িয়া ফেলিতে চায় ; তবে কোন সুখে এরা বাংলায় আরবী হরফের ব্যবহার করিবার কথা বলে?

লেখক উদ্ধৃতাংশগুলির কোন অনুবাদ প্রকাশ করেন নাই। এটা কি ইচ্ছাকৃত ব্যাপার? যদি তাই হয় তবে হয়ত তিনি আরবী বাক্যগুলির অর্থ সম্যকভাবে বুঝিতে পারেন নাই, অথবা তাঁর মতলব সাধু নয়। একে ত লেখক স্বনামধন্য। তার উপ আরবী ভাষাভাষীদের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কীয় আরবী কোটেশান। আরবী না জা অনেক পাঠকের মনের উপর তা হিপনটিজমের মত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

এটি একটি অতি সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা যে, কোন পাঠক তার নিজের ভাষায় লিখিত কোন বই বা অন্য কিছু পড়িবার সময় শব্দের প্রতিটি অক্ষর আলাদাভাবে পড়ে না, পড়িবার প্রয়োজনও থাকে না যখন সে ভাষার সঙ্গে সুপরিচিত হয়। Silent reading বা নীরব পঠনে এমনি প্রতিটি শব্দ পড়ারও দরকার হয় না ; বাস্তব ক্ষেত্রে এই নীরব পঠনই সর্বত্র প্রচলিত। পাঠক থোকা থোকা শব্দের উপর চোখ বুলাইয়া চলিতে থাকে। দর্শন ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা তাকে শব্দসমষ্টির অর্থগ্রহণে ও পরবর্ত্তী বাক্যের অর্থের সঙ্গে ইহার বোধ সাধনে সাহায্য করে। এমনিভাবে ভাষাপরিচয় যতই ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে, পঠনের বেগও ততই বাড়িতে থাকে। আইডিয়া ও শব্দ পাঠকের অভিজ্ঞতার মধ্যে এমনিভাবে যুক্ত হইয়া যায় যে, বাস্তবক্ষেত্রে সে association বা যৌগিক অবস্থাই পঠনের প্রধান সহায়ক। লিখন সম্বন্ধেও সে একই কথা। বাংলা এবং আরবী বর্ণমালার ইতিহাস—শুধু তাই নয়—আরও অনেক বর্ণমালার ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে মানুষ বরাবর প্রত্যেকটি অক্ষর তার আদত আকারে, কিম্বা প্রত্যেকটা অক্ষর পৃথকভাবে কিম্বা প্রত্যেকটা অক্ষর পূর্ণাঙ্গভাবে লিখিবার দায় এড়াইয়াছে। নাস্তালিকের জন্মের—এবং অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত দেবনাগরীকে পরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান বাংলা হরফ গ্রহণের, ইহা অন্যতম কারণ। লিখন প্রণালীর সঙ্গে অভ্যাসের

www.pathagar.com

দৌলতে যে ঘনিষ্ঠতার উৎপত্তি হয় তাহাতে লিখন-দ্রুতি অর্জ্জন করা যায় এবং ঘনিষ্ঠতা যতই বাড়ে ততই পঠন সুবিধার কিছুই ব্যাঘাত না করিয়াও বেগ বাড়িয়া চলে। সুতরাং মাতৃভাষা লিখন ও পঠনের জন্য যে কোন বর্ণমালা চলিতে পারে এবং 'আরবী হরফে লেখা বাংলা' একজন বাঙ্গালীর পক্ষে লিখন ও পঠনের বিবেচনায় বর্ত্তমান 'বাংলা হরফে লেখা ভাষার' মতই সহজ হইবে।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের উপর যথেষ্ট আলোকসম্পাত হইবে যদি একবার দেবনাগরী ও উর্দ্দু হরফের মামলাটা স্মরণ করা যায়। সকলেই স্বীকার করেন যে বাংলা বর্ণমালার যতগুলি গুণ রহিয়াছে, দেবনাগরীতে সে সবগুলিই বিদ্যমান (যথা ঃ স্বরচিহ্নের পরিবর্ত্তে আলাদা বর্ণ রহিয়াছে), অথচ তাহাতে বাংলা বর্ণমালার দোষগুলি কোনটিই দেখা যায় না (যথা ঃ যুক্তাক্ষর, দ্বিত্বাক্ষর, ফলা ইত্যাদি)। প্রকৃতপক্ষে বাংলা বর্ণমালার যত রকম মেরামতের প্রস্তাব হইয়াছে সে প্রস্তাবগুলি বর্ণমালাকে দেবনাগরীর নিকটতর করিয়া দিবে মাত্র। ইংরেজ আমলের সূত্রপাত হইলে দেবনাগরী উত্তর ভারত হইতে প্রায় লোপ পায় এবং তার জায়গা দখল করে পরিবর্দ্ধিত ফারসী বর্ণমালা—যাহাকে উর্দ্দু বর্ণমালা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। জাতীয়তাবোধ উদয়ের সাথে সাথে হিন্দুরা সর্ব্বপ্রথমে এই হরফের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে ইচ্ছা করিল। তাদের মধ্যে এ অনুভূতি জাগিল যে যতদিন উর্দ্দু হরফ চলিতে থাকিবে, ততদিন তারা তাদের চিন্তাধারা ও কৃষ্টির উপর হইতে মুসলিম প্রভাবকে দূর করিতে পারিবেনা। বর্ত্তমান বাংলা বর্ণমালার পক্ষে তার মুসলিম সমর্থকদল যত রকমের ওকালতি করিতেছে এবং যতগুলি যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে সে সবই (বরং তার চাইতে অনেক বেশী) তারা দেবনাগরীর পক্ষে করিয়াছিল। কিন্তু উত্তর ভারতের মুসলমানগণ কি কখনও তাহাতে সম্মত হইয়াছিল? কখনও না, কারণ তারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে উর্দ্দু হরফ পরিত্যাগ তাদের তমদ্দুনী মৃত্যুর কারণ হইবে। প্রকৃতপক্ষে উর্দ্দু হরফ পরিত্যাগের পক্ষে হিন্দুর এ দাবীই মরহুম স্যার সৈয়দ আহমদকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্ভব নয় এবং মুসলমানকে আলাদাভাবে নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের পর যে সমস্ত প্রদেশ কংগ্রেসী সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আসিয়াছিল, সে প্রদেশগুলিতে উর্দ্দু হরফের জায়গায় দেবনাগরীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সরকারের অন্যায় জেদ উত্তর ভারতের মুসলিমদের একযোগে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া মুসলিম লীগে যোগদান করিবার প্রেরণা যোগাইয়াছিল। এতে যথেষ্ট সন্দেহের

www.pathagar.com

অবকাশ রহিয়াছে যে, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি রক্ষার পাকিস্তানের দাবী যতটা প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল, ততটা হইত কিনা যদি হিন্দুরা হরফ পরিবর্ত্তনের দ্বারা মুসলিম তমদ্দুনকে ধ্বংস করিবার অদম্য বাসনাকে সংযত করিতে পারিত। দেশবিভাগের পরও হিন্দুভারত সর্ব্বপ্রথম কাজ হিসাবে উর্দ্দু হরফকে উচ্ছেদ করিয়া নাগরী অক্ষর ব্যবহারে হুকুম জারী করিয়াছে। যে সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্র হিন্দুভারত গ্রাস করিয়াছে (যথা ভূপাল, হায়দারাবাদ) সেখানেও এ হুকুম চালানো হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায়, যে নিখুঁত দেবনাগরী হরফের পুর্ব্বে উত্তর ভারতের নিজস্ব সমস্ত ভাষাগুলি লিখিত হইত, মুসলমানেরা সে সমস্ত ভাষা লিখনের জন্য তাহার স্থলে পরিবর্দ্ধিত আরবী হরফের প্রবর্ত্তন করে এবং পরবর্ত্তীকালে দেবনাগরীর পরিবর্ত্তে আরবী হরফকে বর্জ্জন করিতে অস্বীকার করে যদিও তজ্জন্য তাহাদিগকে অশেষ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। এতেই বুঝা যায়, শুধুমাত্র পঠন সুবিধা ছাড়াও হরফ পরিবর্ত্তন প্রশ্নের সাথে আরও কতগুলি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সংযোগ রহিয়াছে। অন্যথায় হিন্দুরা দেবনাগরীর পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য এত বদ্ধপরিকর হইত না এবং মুসলমানেরাও ইহার বিরুদ্ধতায় এত দৃঢ়সংকল্প এবং এত নির্য্যাতন ভোগের সম্মুখীন হইত না। আজও ভারতে এমন হাজার হাজার হিন্দু রহিয়াছে যাহাদের হাত দেবনাগরী অপেক্ষা উর্দ্দু লিখনে অধিকতর পাকা। কিন্তু মজার কথা এই যে, (এবং এ কথাটি আমাদের চোখে ফোটা উচিৎ) তাদের মধ্যে কেউ আজ একটি কথাও বলে নাই। কারণ তারা জানে যে প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন মুসলিম তমদ্দুনী প্রভাবের অবসান ঘটাইবে। তবে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, বহু শতাব্দীর পরাধীনতা সত্ত্বেও উত্তর-ভারতের হিন্দু মনের উপর মুসলিমের তমদ্দুনী বিজয় অতখানি পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল না, যতটা হিন্দুদের শুধু দেড়শ বছরের তমদ্দুনী প্রাধান্য পূর্ব্ববঙ্গের একশ্রেণীর মুসলিম মনকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছে?

(৭) 'আরবী অক্ষর প্রবর্ত্তন শিক্ষাবিস্তারের গতিকে রুদ্ধ করিয়া দিবে'— কেহ কেহ এ জাতীয় উক্তি করিয়া আর একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। কেন রুদ্ধ করিবে, তাহা ইহারা বলিয়া দেন নাই। অপরপক্ষে আরবী বর্ণমালার সমর্থকদের মতে আরবী হরফের দৌলতে নিরক্ষরতা দূর করিবার কাজ অপেক্ষাকৃত দ্রুত আগাইয়া যাইবে (কারণ পরে বলা হইবে)। এ দাবীর সত্যতা বা অসত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট পূর্ব্ববঙ্গে ২০টি বয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই কেন্দ্রগুলিতে আরবী হরফে বাংলা শিক্ষার এক্স্‌পেরিমেন্ট চলিবে এবং দেখা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দিনে উত্তর ভারতে উর্দ্দুর অবস্থাও তাই ছিল। উর্দ্দু ভাষার সাহিত্য তখনও সমৃদ্ধ হয় নাই। কিন্তু তবুও উর্দ্দু বাঁচিয়া গিয়াছিল ; মুসলমানী বাংলার যে ভাগ্যবিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল, উর্দ্দু সে দুর্ভাগ্যের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। কারণ ইহার বহুকাল পরে ব্রিটিশ উত্তর ভারতে পদার্পণ করিয়াছিল এবং ততদিনে সাহিত্যিক ও দরবারী ভাষা হিসাবে উর্দ্দু দিল্লী ও লখনৌর রাজ-দরবারে শিকড় গাড়িবার অবকাশ পাইয়া গিয়াছিল। ব্রিটিশের আগমনে বাংলার মুসলমানের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও তমদ্দুনী জীবনে কি সর্ব্বনাশের বান ডাকিয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। আত্মসম্মান বোধ ও নিজস্ব জিনিষের প্রতি দরদ মুসলমানকে নতুন শাসকবর্গের সঙ্গে পূর্ণভাবে তরকেমওয়ালাত করিতে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল এবং এই জন্য তাহাকে প্রচুর লোকসান কবুল করিতে হইয়াছিল। খালি ময়দান পাইয়া হিন্দুরা নতুন প্রভুর কৃপায় আসর জমাইয়া বসিল। এরূপে হিন্দুরা নতুন শিক্ষানীতিকে রূপ প্রদান ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিল।

বিদ্যাসাগর এণ্ড কোম্পানীর প্রভাবে দেশের সরল সোজা ভাষার চেহারা বদলিয়া গেল—মুষ্টিমেয় সংস্কৃত পণ্ডিত ছাড়া দেশের প্রায় লোকের অজানা, মুসলমানদের সকলেরই অজানা, গালভরা জমকালো সংস্কৃত শব্দের আমদানী হইল। সংস্কৃত শব্দের সাথে আসিল একটু পরিবর্ত্তিত আকারে সংস্কৃত বর্ণমালা। বাংলা ভাষার লিখ্য ও কথ্যরূপের মধ্যে যতটা ফরক, ততটা পৃথিবীর অন্য কোন ভাষার দুইটি রূপের মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ। সংস্কৃত শব্দের পাইকারী আমদানীই এই প্রভেদের কারণ। বর্ত্তমানে উত্তর ভারতে যে অঘটন ঘটিয়াছে, তার দিকে এক নজর দেখিলে প্রত্যেকে বুঝিতে পারিবে, অতীতে বাংলা ভাষাকে কি কি অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলিম, উভয়ের জবানে যে সব অতি সহজ আরবী-ফারসী শব্দ অতি স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হইয়া আসিতেছিল, কেবল মুসলমানী হওয়ার অজুহাতে আজ সে সব শব্দ ভাষা হইতে উৎপাটিত হইতেছে এবং দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ তাদের জায়গা দখল করিয়া চলিয়াছে। সত্য বটে, ভাষা সাময়িকভাবে সাধারণ মানুষের বোধের অগম্য হইতেছে। কিন্তু কালক্রমে বাংলার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে। বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যপুস্তকাদির একসময় আসিবে যখন এই কৃত্রিম জবানই ভাষার মানদণ্ড এবং সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে আদর্শ ভাষা বলিয়া বিবেচিত হইবে। যে সব ফারসী-আরবী শব্দ বর্ত্তমানে খুব উচ্চাঙ্গের ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা তখন অপাংক্তেয় বা সাধারণ বাংলা কথায় অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। একথা

www.pathagar.com

নিঃসন্দেহ, যদি বাংলা দেশে বৃটিশ এক শতাব্দীকাল পরে আসিত, তবে আজিকার দিনে বাংলা আরবী হরফেই লিখিত হইত এবং উর্দুর মতই ইসলামী জবানরূপে গণ্য হইত। মুসলমানেরা আরবী হরফ চালু করিবার একস্‌পেরিমেন্ট চালাইয়াছিল এবং অনুপযোগী বিবেচনায় তাহাকে বর্জ্জন করিয়াছিল, একথাটি আদৌ সত্য নয়। সত্য কথা এই যে, তাদের কোন এখ্‌তেয়ারই ছিল না। তাদের শিক্ষা-নীতির নিয়ন্ত্রণ হিন্দুর হাতে চলিয়া গিয়াছিল এবং যে ছিটে-ফোটা তাদের ভাগ্যে জুটিত, তাহা লইয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দেশজ ধ্বনিগুলি প্রকাশের উপযোগী করিবার জন্য আরবী বর্ণমালার পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছিল। অতঃপর এই বর্ণমালা যেভাবে সিন্ধি, হিন্দী ও পস্‌তু ভাষাসমূহের বাহন হইয়াছিল, একই ভাবে বাংলারও বাহন হইতে পারিত। দুনিয়ার যে সুবিশাল অংশের উপর মুসলমানের কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে তন্মধ্যে একমাত্র পূর্ব্ব বাংলায়ই মাতৃভাষায় আরবী হরফ চলে না। এখানে প্রায় দুই শতাব্দী যাবত আমরা আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ছিলাম না। এই কারণে আমদিগকে মুখ বুজিয়া যে সব জবরদস্তি সহ্য করিতে হইয়াছিল, সংস্কৃত শব্দসমূহ (যাদের কতক মুসলিম ভাবধারার প্রতিকূল এবং পৌত্তলিক ভাবে পরিপূর্ণ) ও সংস্কৃত হরফ তাহাদের সামিল। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর অশেষ মেহেরবানীতে আমাদের রাজনৈতিক গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করিয়াছেন। প্রশ্ন এই, আমরা এখন আমাদের তমদ্দুনী গোলামীর শিকলও ছিন্ন করিব কিনা? যেহেতু এই শিকলগুলি এতদিনে আমাদের শরীরের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল, খসাইবার বেলায় খানিকটা চামড়াও খসিয়া যাইতে পারে (অবশ্য চামড়া যাহাতে না খসে সে জন্য সবরকমের সাবধানতা অবলম্বন করা যাইতে পারে) এবং সাময়িক সামান্য ব্যথাও অনুভব করিব। কিন্তু জখম শীঘ্রই শুকাইবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে নূতন সুস্থ চর্ম্ম গজাইবে। যে রাজনৈতিক শিকল আমাদের জাতির অঙ্গে দাগ কাটিয়া বসিয়া গিয়ছিল, আমরা ভাল করিয়াই জানিতাম, তাহাকে উপড়াইবার সময় শরীরের কতকটা গোস্‌ত্‌ও ছিঁড়িয়া আসিবে। প্রকৃতপক্ষে খানিকটা গোস্‌ত ছিঁড়িয়াও গিয়াছিল, খুনও বহিয়াছিল এবং যাতনায় আমরা ছটফটও করিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা বুঝিয়াছিলাম এ সমস্তই পরিণামে আমাদের মঙ্গল বিধান করিবে। আল্লার মেহেরবাণীতে সে গভীর জখম প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছে। সে ঘা শুকানোর কাজটি ত্বরান্বিত হইবে যদি ইসলামী ভাবধারা ও কৃষ্টির তাজা খুন আমাদের শরীরে প্রবিষ্ট করা হয়।

www.pathagar.com

সোজা কথায় বলিতে গেলে পূর্ব বাংলার মুসলমানের সামনে চারিটি পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে, যথা ঃ—

(ক) তারা হয়ত বলিবে, তারা কোর্‌আন-মজীদ পড়িতে চায়না ; কিন্তু এটা সম্ভব নয় যদি তারা ইসলামের দাবী করে,

(খ) অথবা স্থির করিবে, তারা কোরআন-মজীদও বাংলা হরফে শিখবে—কিন্তু এ'টা অবাস্তব,

(গ) অথবা তারা বাংলার জন্যও আরবী হরফ ব্যবহার করিবে,

(ঘ) নতুবা চিরকালের জন্য দুইটি বর্ণমালা শিক্ষার অসুবিধা ভোগ করিবে।

শেষোক্ত পথে চলার আনজাম ভাল করিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কোরআন পাঠের জন্য (প্রসঙ্গক্রমে রাষ্ট্রভাষার জন্যও বটে) আরবী বর্ণমালা শিক্ষার অব্যবহিত পরেই মাতৃভাষা লিখন পঠনের জন্য আরও একটি বর্ণমালা শিক্ষার ফল কচি মন ও মস্তিষ্কের উপর অতি ভয়াবহ হইতে বাধ্য। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের অপর সুবাগুলির শিশুরা একটি মাত্র বর্ণমালা শিক্ষা করিবে। কেবল বাঙ্গালী শিশুকেই এই অতিরিক্ত বোঝা বহন করিতে হইবে। অপরাপর বিষয়ে সমতা থাকিলেও এই অতিরিক্ত বোঝায় ভারাক্রান্ত শিশুর পক্ষে জীবনযাত্রার প্রতিযোগিতায় ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া শক্ত হইবে ; কারণ ওরা এভাবে ভারাক্রান্ত নয়। দৌড়ে সে পিছাইয়া পড়িবে, অক্ষমতার গ্লানি ক্রমে তার মনের উপর নিকৃষ্টতার ভাব (inferiority complex) আনয়ন করিয়া তাহাকে অবসন্ন করিবে। দূর ভবিষ্যতে এ ব্যবস্থার পরিণাম অতি ভয়াবহ হইবে। কি অধিকারে আমরা আমাদের শিশু সন্তানের উপর এবং সেই শিশু সন্তানের বংশাবলীর উপর এইরূপ অভিশপ্ত জীবনের কায়েমী বন্দোবস্ত চাপাইতে পারি? নিজেরা কিছু অসুবিধার হাত হইতে নাজাত পাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে যাইতেছি, তাহাতে কি আমাদের হীন স্বার্থপর মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় না? একবার ভাবুন এবং নিজের মনকে যাচাই করুন, সম্ভবতঃ আমাদের মন 'অজানার ভয়ে' আচ্ছন্ন হইয়াছে। সাহসের সহিত বাস্তবের সম্মুখীন হতে হইবে, তবেই আমরা বুঝিতে পারিব, হরফ পরিবর্ত্তন যে সব অবস্থার সৃষ্টি করিবে, তাহা আমাদের আনজাম ভালই করিবে। এ পরিবর্ত্তন আমাদের শিশু সন্তানকে, পাকিস্তানী ও মুসলিম জাহানের অধিবাসী তাদের অপর ভাইবোনদের সঙ্গে একই সমতলে দাঁড়া করাইয়া দিবে। আমাদের বিচার্য্য বিষয় এই নয় যে আরবী এবং বাংলা বর্ণমালাদ্বয়ের

www.pathagar.com

কোন একটিকে বাছিয়া নিতে হইবে—যেমন ভুলবশতঃ কেহ কেহ ভাবিয়া থাকে। প্রথমোক্তটি অবশ্যই শিখিতে হইবে। সুতরাং বিচার্য্য বিষয় এই একটির পরিবর্ত্তে দুইটি বর্ণমালা অর্থাৎ আরবীর সঙ্গে বাংলার দুঃসাধ্য বর্ণমালাটি—শিখিবার অসুবিধা ভবিষ্যতে সন্তানগণের মাথায় আমরা চাপাইয়া দিব কিনা—এমন কি তার ভয়াবহ পরিমাণগুলি দেখিয়া শুনিয়াও?

বাংলা হরফ যতই উত্তম হউক, এমন কি দেবনাগরীর স্বপক্ষে যতটা পূর্ণতার দাবী করা হয় তাহাও যদি বাংলা হরফে থাকে, তবুও ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভবিষ্যতের খাতিরে বাংলা হরফকে ত্যাগ করিবার জন্য যেমন এককালে মুসলমানেরা দেবনাগরী পরিত্যাগ করিয়াছিল, উপরের বিবেচনাগুলিই আমাদের জন্য যথেষ্ট জোরালো। প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা হরফ কিন্তু দোষমুক্ত ও পূর্ণতাসম্পন্ন নয়; ইহা কতকগুলি মারাত্মক দোষে দুষ্ট। তার প্রমাণ, কেহই এ হরফকে তার বর্তমান আকারে চালু রাখিবার পক্ষপাতী নয়। দেশবিভাগের বহু পূর্ব হইতেই ইহার মেরামত বা পরিবর্ত্তনের বহু প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। পশ্চিমবঙ্গের একটি শক্তিশালী দল রোমান অক্ষর গ্রহণের পক্ষপাতী। ডাঃ সুনীতিকুমার চাটার্জ্জী এই দলের মুখপাত্র। (অবশ্য ইদানিং ডাঃ চাটার্জ্জী মাছলাহাতের জন্য মত পরিবর্ত্তন করিয়া দেবনাগরী হরফ ব্যবহারই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিতেছেন)। এখানেও তাদের অনেক সমর্থক রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের স্কুলসমূহে দেবনাগরী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বিচিত্র কিছুই নয় যে, হয়ত অবস্থার চাপে শেষ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বাংলাও দেবনাগরী হরফে লিখিত হইবে। বাংলা সাহিত্যের কিছু কিছু বই নাগরী হরফে মুদ্রিত হইয়াছে—তন্মধ্যে রবীঠাকুরের বইও আছে। কথা হইল, আমরা বাংলা হরফের পরিবর্ত্তন বা পুনর্গঠন ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গবাসীর পরামর্শ লইব কি না? নিশ্চয়ই না, হাজারবার না। কিন্তু কতকগুলির সাময়িক সুবিধা বজায় রাখিবার তাগিদে উভয়বঙ্গে যাতে বাংলা একই হরফে লিখিত হয়, তার ব্যবস্থা করিতে গেলে পশ্চিম বাংলার সঙ্গে যুগ্ম ব্যবস্থা ছাড়া উপায় নাই। এতে নারাজ হলে দুই বঙ্গে ভিন্ন রকম পুনর্গঠন হইবে, কিংবা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা হরফ ত্যাগ করিতেও পারে। এ পারের বাংলা তখন ওপারের ভাষা হইতে শুধু শব্দসমষ্টিতে নয় বর্ণেও পৃথক হইয়া যাইবে। অবস্থার মোড় তখন সম্পূর্ণরূপে ঘুরিয়া যাইবে। পূর্ব্ববঙ্গের বাংলার তখনকার যে বর্ণমালা, তার ক্ষেত্র পূর্ব্ববঙ্গের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে। ইহাতে টাইপ ও মুদ্রণের কাজ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হইবে, সন্দেহ নই। তাই বলি, যদি পরিবর্ত্তনই করিতে

www.pathagar.com

হয়—করিতে ত হইবেই তবে ভবিষ্যতের সমস্ত অসুবিধার পথ বন্ধ করিয়া চিরকালের তরে আরবী হরফকে গ্রহণ করি না কেন? বর্ত্তমান সাহিত্যসম্পদকে পুনর্মুদ্রিত করা—তা সে আরবী হরফে যেমন, পুনর্গঠিত বাংলা হরফেও তেমনি করিতে হইবে। এবং আরবী হরফ গ্রহণ করিলে সুবিধা এই হইবে যে, একই রকমের টাইপ এবং একই শ্রেণীর কম্পোজিটার দ্বারা আরবী, উর্দ্দু এবং বাংলা মুদ্রণের কাজ চলিতে পারিবে। ইহাতে পরিণামে যথেষ্ট মূলধন ক্যাপিটাল ও পৌনঃপুনিক (রেকারিং) ব্যয়ের সঙ্কোচ সাধিত হইবে। সেকেণ্ডারী স্কুলসমূহে বাধ্যতামূলকভাবে উর্দ্দু পড়ান আরম্ভ হইয়াছে, পুস্তক প্রকাশকগণ তাদের আরবী মুদ্রণ শাখাকে বাড়াইয়া লইবে। বাংলা হরফ থাকিয়া যাউক বা বর্জ্জিত হউক, যে কোন অবস্থায় ছাপাখানার আরবী-উর্দ্দু মুদ্রণ ব্যবস্থা বাড়িতেই থকিবে। প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলা যাইতে পারে। পাকিস্তানী ভাষাসমূহের বর্ত্তমান হরফকে বাদ দিয়া আরবী হরফকে তার জায়গায় বসানোর প্রস্তাব শুধু বাংলা নয় উর্দ্দু সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। বর্তমানে উর্দ্দুতে ব্যবহৃত পারসিয়ান নাস্তালিক টাইপকে বাদ দিয়া আরবী নস্‌খ্ টাইপ অবলম্বন করা হইবে। যে হরফ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইবে—অবশ্য অতি সামান্য পার্থক্যের সাথে—তার মুদ্রণ ও টাইপ যন্ত্র তৈরী হইবে বিরাট বহরে ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার তাগিদে। সুতরাং যন্ত্রের সরবরাহ হইবে প্রচুর এবং সুলভ। ব্যবসা নষ্টের যে ত্রাস আমাদের পুস্তক প্রকাশকগণের মনে সঞ্চার করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। হয় আরবী হরফের সমালোচকদের মধ্যে চিন্তা ও দূরদর্শিতার অভাব অথবা তারা ত্রাসের সঞ্চার করিয়া মুদ্রণ ব্যবসায়ীদের ক্ষমতা ও টাকা তাদের আরবী হরফ বিরোধী প্রচার কার্য্যে খাটাইবার কূমতলব আঁটিয়াছে। আসল কথা এই—আরবী হরফের দরুণ পাবলিশারদের কোন ক্ষতির আশঙ্কা ত নাইই, বরং বিস্তর লাভের সম্ভাবনা আছে।

(১১) অন্যপক্ষে (বিষয়াটর গুরুত্ব অতি বেশী) বাংলা অক্ষর বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর তমদ্দুনী প্রাধান্যের বিরাট সৌধ ভূমিসাৎ হইবে, কারণ এই অক্ষরই সেই সৌধ কোণের বুনিয়াদী পাথর। উর্দ্দুর উপর দেবনাগরী অক্ষর চালাইয়া ভারতীয় মুসলিমের কালচার ধ্বংস করিবার হিন্দু ষড়যন্ত্রের ইহাই দাঁতভাঙ্গা জওয়াব হইবে। ভাষা, বর্ণমালা ও কালচার এ তিনের সম্বন্ধ অতি নিবিড়। যেভাবে সংস্কৃতজ কোন হরফ সাথে করিয়া বহিয়া আনে হিন্দুর ধর্ম্ম ও কালচারসংশ্লিষ্ট শব্দসমূহকে, ঠিক তেমনি আরবী হরফ ভাষায় আনিয়া দিবে আরবী ফারসী শব্দসম্পদ যার মধ্যে ইসলামের

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিফলিত থাকিবে। আরবী হরফে লিখিত সবগুলি ভাষায় এইভাবে ইসলামী ভাবধারা প্রবাহিত হইয়াছে। এখন যেহেতু এই প্রদেশের সেকেণ্ডারী স্কুলসমূহের মধ্যে উর্দ্দুকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে, ভবিষ্যৎ বংশাবলী উর্দ্দু ভাষা ও হরফের সাথে অতটা ঘনিষ্ঠতা অর্জন করিবে যতটা ঘনিষ্ঠতা বর্তমানে ইংরাজীর সঙ্গে আমাদের রহিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে উর্দ্দু ও মুসলমানী বাংলার মধ্যে গঠনপ্রণালী ও শব্দসম্পদের এতই সাদৃশ্য রহিয়াছে যে, ইংরাজীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অধিকতর স্বচ্ছন্দ হইবার কথা। উভয়ের একরকম হরফ উর্দ্দুর সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে আরও নিকটবর্ত্তী করিয়া দিবে, একরকম হরফের এই সেতুর উপর দিয়া এক ভাষায় শব্দ ও ব্যবহারভঙ্গী অন্য ভাষায় গমনাগমন করিবে ; এই প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতায় উভয় ভাষা সমৃদ্ধ হইবে। যে সব সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে ইসলামবিরোধী ভাবের যোগাযোগ আছে, অথবা যেগুলি তাদের দুর্বোধ্যতার দরুণ জনসাধারণের ভাষায় খাপ খাইতে পারে নাই, সংস্কৃতজাত বর্ণমালার সাথে তারাও বিদায় নিবে। দুশমনরা আমাদের জাতীয় সমাজবন্ধনের মধ্যে যে কালচারগত ভেদনীতি চালাইবার চেষ্টা পাইতেছে তাহা তখন আপনাতেই খসিয়া পড়িবে। তখন আমরা রাজনৈতিকভাবে যেমন, তেমনি কালচারগত ভাবেও এক জাতি হিসাবে দাঁড়াইব। রাজনৈতিক ইত্তেহাদ বেশী টেকসই হয় না, যদি তাহাকে কালচারগত ইত্তেহাদের সিমেন্টে আঁটা না যায়, এ কথাটি খুব জোরের সাথে বলিবার কোন প্রয়োজন হয় না। আমাদের দুশমনরা এ সত্যটি ভাল করিয়াই জানে। মুসলমানকে তা রাজনীতিক্ষেত্রে গোমরাহ করা গেল না। তাদের মনের অতি প্রিয় বাসনা, যে কালচারের ক্ষেত্রে তাদের এতদিনকার প্রাধান্য, সেখানে মুসলমানকে বিভ্রান্ত করিয়া পথহারা করা যায় কিনা। কে না জানে যে দেশবিভাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত 'বাঙ্গালী' ও 'ভদ্রলোক' পদবাচ্য হইবার অধিকার একচেটিয়া হিন্দুরই ছিল। তখনকার দিনে হিন্দুরা মুসলমানকে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিত না এবং মুসলমানরাও মুসলিম ছাড়া অন্য কোন আখ্যায় অভিহিত হইবার বাসনা রাখিত না। দেশবিভাগের পর আচমকা 'ফ্রন্ট' বদলিয়া গেল, মুসলমান 'বাঙ্গালী' আখ্যায় অভিহিত হইতে আরম্ভ করিল। আসল মতলবটা বেশ পরিষ্কারভাবেই ধরা যায়—হিন্দু-মুসলমান উভয়কে 'বাঙ্গালী' নামধেয় করিয়া লইয়া কালচারের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সম-স্বার্থ বোধ জাগাইবার কোশেশ চলিয়াছে। পাকিস্তানীদের মধ্যে বিচ্ছেদের মনোভাব সৃষ্টি করিয়া পাকিস্তানকে ধ্বংস করিবার জন্য আমাদের দূরদর্শী শত্রুরা যে সুদূর-প্রসারী কূচক্রী প্ল্যান আঁটিয়াছে, তার

www.pathagar.com

ফন্দি'। এই সেদিন যাবত যারা পাকিস্তানের কৃতসংকল্প দুশমন ছিল—যারা বঙ্গভঙ্গ ঘটাইয়াছে, তারাই আবার কালচারের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের একতার বুলি আওড়াইতেছে। যারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় পূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছে, তাদের চাইতে এরাই নাকি আমাদের বেশী দরদী বন্ধু। শিশুর প্রতি মাসীর দরদ যখন মায়ের মহব্বতকে ছাড়াইয়া যায়, বুদ্ধিমান লোক তখন মাসীকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং তার অভিপ্রায় সম্বন্ধে সতর্ক হয়। যাঁদের সম্পর্কে আশা করা গিয়াছিল যে তাঁরা ইহা আঁচ করিতে পারিবেন, সে রকম কতক মুসলমান কিস্‌মতের ফেরে শত্রুর জালে পড়িয়া গিয়াছে। বক্তৃতামঞ্চ ও খবরের কাগজ মারফৎ তাঁহারা ইহাই প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন যে বাঙ্গালী মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে তফাৎ কেবল উপরকারই, কালচারের বেলায় তারা অভিন্ন এবং এক। কেউ কেউ এই গোলের আরও আগাইয়া গিয়াছেন ; তাঁরা বলেন, "আমরা পয়লা বাঙ্গালী, তারপর মুসলমান।" ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে দুনিয়ার লোক তাদের জিজ্ঞাসা করিতে পারে, "তাই যদি সত্য হয়, তবে পাকিস্তানের কি প্রয়োজন ছিল?" পাকস্তানের গোড়ার কথাই ছিল এই যে হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য উপরকার নয়, বরং গভীরভাবে ভিতরকার এবং বুনিয়াদীও বটে ; বস্তুতঃ তাদের মধ্যে ব্যবধান এত বড় যে তারা দুই আলাদা জাতি নয়। কেবল এই সমস্ত মুসলিম-বিরোধী ও পাকিস্তান-বিরোধী কারসাজীর সাফল্যের উৎসাহেই বিগত হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে সাভারকার ও ডাঃ খারে পরিষ্কার ভাষায় ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, কালচার হিসাবে পূর্ব-বঙ্গকে পুনরায় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করিয়া ভারতের অংশবিশেষে পরিণত করিতে হবে। যদি এই ভয়াবহ অঘটনের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হয়, তবে "কমন কালচার"-রূপ যে বিগ্রহের পূজা আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, সর্বপ্রথম সে প্রতিমাকে ভাঙিয়া চুরমার করিতে হইবে। আরবী হরফ হাতুড়ীস্বরূপ সে প্রতিমাকে চিরকালের জন্য চূর্ণ করিবে। আরবী হরফ গ্রহণের মত পরিবর্তনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব কতখানি হইবে, আমাদের অতি-দরদী বন্ধুরা (?) খুব ভাল করিয়াই বোঝে ; সুতরাং ইহাকে ঠেকাইবার জন্য তারা তাদের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে। কিন্তু যদি আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখি এবং তাদের চালবাজী টের পাই, তবে তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে যেমনটি হইয়াছিল তাদের পাকিস্তানকে ঠেকাইবার কোশেশ।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনের সমর্থকগণ দাবী করেন যে ইহা শিক্ষা বিস্তারের গতিবেগ বাড়াইয়া দিবে। এ দাবীটি যাচাই করিয়া দেখা দরকার। আমাদের শিশু সন্তানদের

www.pathagar.com

জন্য উর্দু, আরবী ও বাংলার একই হরফের যে সুবিধা তাহার বর্ণনার যরুরত নাই। বয়স্কদের কথা ধরা যাক। জীবিকা নির্বাহের উপায় এবং ধর্ম্ম-অপরাপর বিষয় অপেক্ষা এ দুটি বিষয়ে তাহাদের স্বার্থ বেশী, এ সম্বন্ধে শিক্ষাবিদগণ একমত। আমাদের দেশের বয়স্কদের সম্বন্ধে এ কথাটি বিশেষভাবে খাটে। তারা অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ, মেয়েরা আরও বেশী। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মুসলমানের কোরআন-মজীদের হাসিল করিতে হইবে, এ জাতীয় আপিল সোজা-সুজি তাদের অন্তরের অন্তস্থলে পৌঁছে। এলেম হাসিল করার সাধারণ সুবিধাগুলির ব্যাখ্যা তাদের মনে বিশেষ সাড়া জাগায় না। একবার কোরআন-মজীদ পড়া শিখিলে এর পরবর্ত্তী ধাপে কোরআনের হরফে মাতৃভাষার লিখন ও পঠন তাদের জন্য স্বাভাবিক ও সোজা হইয়া পড়িবে। একটু ধর্ম্মের ছোঁয়াচ আছে বলিয়া অন্য উপায় অপেক্ষা কোরআন-মজীদের হরফে তাদের মধ্যে বিশেষতঃ বয়স্ক মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার দ্রুততর হইবে। ফোরকানিয়া অর্থাৎ কেবল কোরআন শিক্ষাদানকারী মাদ্রাসাসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য একটি জোরালো দাবী উঠিয়াছে। ইহাতে আরবী-অক্ষর-জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের সংখ্যা অবশ্য বাড়িয়া যাইবে। সেই অক্ষরেই যদি তাদের লেখাপরা শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে নিরক্ষরতা দূর করিবার পথে অনেকদূর অগ্রসর হওয়া যাইবে।

(১৩) হালে আরবীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবার পক্ষে যে দাবী করা হইয়াছে, তাহাও আমাদিগকে ঐ একই পথনির্দ্দেশ করে। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, সমাজ ক্রমাগত ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এবং তারা বাংলা বর্ণমালা ও কালচারের অবদান সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার মোহপাশ ছিন্ন করিতে চায়। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে আরবীর সমর্থকদের যুক্তিতে এইটুকু অসঙ্গতি দেখা যায় যে, তাঁহারা একই নিয়মে আবার বাংলা ভাষায় সংস্কৃতজ বর্ণমালাকে রাখিয়া দিতে চান। এই অসঙ্গতির দরুণ তাঁদের দাবীর আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহকে মনে স্থান দেওয়া—যেমন কতক লোক দিয়া থাকেন—বোধ হয় অযৌক্তিক। আশা করা যায় যে, যখন তাঁহারা আকাশচারী ভাবপ্রবণতা হইতে নামিয়া বাস্তবের কঠিন মাটিতে পা দিবেন তখন তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন, তাঁদের প্রস্তাবিত ব্যবস্থার যুক্তিসম্মত পরিণামে প্রথম সোপান হিসাবে আরবী অক্ষরমালাকে গ্রহণ করিতে হয়, যেমন মুসলিম জাহানের অপরাপর দেশগুলি করিয়াছে। সে দিন হয়ত বেশী দূরে নয়, যে দিন আরবী পুনরায় ইসলামের আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে তাহার স্থান গ্রহণ করিবে। যাহারা দূরদর্শী তাহারা বেশ বুঝিতে পারে যে, হরফ পরিবর্ত্তন পাকিস্তান

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠার মতই অপরিহার্য্য ও অনিবার্য্য। হিন্দুদের কথা না হয় বাদ দেওয়া গেল, অনেক মুছলমানও (কতেক সদিচ্ছায় আর কতেক শত্রুর টাকার মোহে) পাকিস্তান আন্দোলনের মোখালেফ ছিল, কিন্তু তাহার জন্মকে ঠেকাইতে পারিল না। অনুরূপভাবে ঐ উভয় দলের কতিপয় মুসলমান এই গুরুত্বপূর্ণ পরিণতিমূলক পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধতা করিতেছে। যারা ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়, তারা সমস্ত যুক্তিতর্কের অতীত। তারা তাদের মনের আগুনে পুড়িয়া মরুক। সৌভাগ্যের কথা, তারা দলে ভারী নয়। কিন্তু বিরোধী দলের অকিাংশই যথাযথ খবর রাখেন না এবং স্বার্থপর লোকদের প্রচারিত নানা প্রকার আশঙ্কার জগদ্দল পাথর তাদের মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই কয়টি পৃষ্ঠা তাদের প্রতি নিবেদিত হইল। আশা করি, এই আলোচনা তাদের মনে এই বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করিবে যে, আমাদের সন্তানগণকে পাকিস্তানের তথা মুসলিম জাহানের অপর অংশসমূহের শিশুগণের সঙ্গে একই সমতলে দাঁড় করাইবার জন্য, হিন্দু কালচার ও তার ইসলামবিরোধী ভাবধারার গুরুভার হইতে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মনকে মুক্ত করিবার জন্য, কালচারের নামে বিভেদ সৃষ্টির যে Wedge আমাদের মধ্যে দলাদলির সুত্রপাত করিয়াছে তাহাকে সমাজদেহ হইতে উপড়াইবার জন্য, পাকিস্তানের ঐক্যবন্ধনকে মজবুত করিবার জন্য এবং নিরক্ষর জনগণের মধ্যে দ্রুত শিক্ষাবিস্তারের জন্য আজ পর্য্যন্ত যতগুলি অত্যন্ত জরুরী ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হইয়াছে, আরবী হরফ গ্রহণ তন্মধ্যে অন্যতম—সম্ভবতঃ ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জরুরী। এতে তাদের স্বার্থের প্রতিকূল কিছু ঘটিতে পারে, এ কথা মুখে আনিবার নয়। একবার এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিহিত শুভ পরিণতিগুলি সম্যক বুঝিতে পারিলে, বিরুদ্ধতা ত দূরের কথা, আমাদের জনগণ প্রস্তাবটিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবে এবং যথাসম্ভব সত্বর কার্য্যক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ দাবী করিবে, সন্দেহ নাই। এ পথেই আমাদের বর্ত্তমান জীবনে মুক্তির সন্ধান মিলিবে এবং হয়ত ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানদের এই বিশ্বাস, পরবর্ত্তী জীবনের মুক্তিও এই পথেই রহিয়াছে। আর মৌলানা জুলফিকার আলী, এ কাজের সর্ব্বপ্রধান অগ্রদূত—তিনি মনে করিবেন, রছুলে করীমের ইচ্ছা পূর্ণ হইল।

Printed by M. K. Nazir, at the Printing House 35, Ashak Lane, Dacca.

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্রকারীদের স্বরূপ উদঘাটন

গত ২৪শে মার্চ্চ তারিখে
পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে প্রদত্ত
জনাব নূরুল আমীনের বক্তৃতা

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্রকারীদের স্বরূপ উদঘাটন

[গত ২৪শে মার্চ্চ তারিখে পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে প্রদত্ত জনাব নূরুল আমীনের বক্তৃতা]

গত ২৪শে মার্চ্চ তারিখে পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমীন প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদে ঢাকার সাম্প্রতিক গোলযোগ সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন। নিম্নে তাঁহার বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হইল ঃ—

"বাজেট অধিবেশনের মাঝখানে আকস্মিকভাবে পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করা হইয়াছিল। যে সকল ঘটনা ও পরিস্থিতির ফলে সরকার এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার মনে করিয়াছিলেন, তৎসম্পর্কে যতদূর সম্ভব পরিষদের সদস্যগণকে অবহিত করা আমি কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় অনুষ্ঠিত গোলযোগের উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য এবং পরিস্থিতি আয়ত্তে আনয়নের জন্য সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তৎসম্পর্কেও আমি কিছু বলিব। আলোচনা প্রসঙ্গে হয়ত আমাকে আমার ২৪শে ফেব্রুয়ারী ও ৩রা মার্চ্চের বেতার বক্তৃতায় উল্লেখিত কতকগুলি বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিতে হইবে। তবে ইতিপূর্বে আমি যাহা বলিয়াছি, আজ তদপেক্ষা অধিক কতকগুলি তথ্য আপনাদের নিকট পেশ করিব।

ভাষা আন্দোলনের পশ্চাতে

প্রারম্ভেই আমাকে বলিতে হইতেছে যে, বাহ্যতঃ যাহা বাংলা ভাষার স্বপক্ষে নির্দ্দোষ ও বাস্তবিকই ন্যায্য আন্দোলন বলিয়া মনে হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহা ছিল বলপূর্ব্বক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার, প্রদেশব্যাপী গোলযোগ সৃষ্টির এবং পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যাহত করার সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টাকে ছদ্ম আবরণ দেওয়ার একটি পন্থা মাত্র। সরকার যতদূর প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন কম্যুনিষ্ট, বিদেশী দালাল এবং হতাশ রাজনীতিক দেশের অভ্যন্তর হইতে রাষ্ট্র ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল জনসাধারণ তাহা জানে এবং সেগুলি হইতেও উক্ত ষড়যন্ত্রের কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

www.pathagar.com

আন্দোলনের প্রস্তুতি

তাহাদের এই ষড়যন্ত্র বাস্তবে রূপায়িত করার প্রথম নিদর্শন ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জনসাধারণের নিকট উদ্‌ঘাটিত হইলেও ইহার প্রস্তুতি চলিতেছিল উক্ত তারিখের পূর্ব্ব হইতেই। বিভিন্ন সূত্রে সরকারের নিকট খবর আসিতেছিল যে, পাকিস্তানের চিন্তাও একদিন যাহাদের কাছে অভিসম্পাতস্বরূপ ছিল, পাকিস্তান ধ্বংস করিবার জন্য না হইলেও অন্ততঃ রাষ্ট্রকে দুর্ব্বল করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রদেশে গোলযোগ সৃষ্টির জন্য তাহারা পাকিস্তানের অভ্যন্তরস্থ কতিপয় রাজনৈতিক সুবিধাবাদীর সহিত হাত মিলাইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যাপক আয়োজন চলে। বিগত বহু মাস ধরিয়া নাশকতামূলক কার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে বিভ্রান্ত করিতেছিল। তাহারা একটি উপযুক্ত সুযোগের সন্ধানে ছিল। স্বভাবতঃ আবেগোদ্দীপক ভাষা আন্দোলনের মধ্যে তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ লাভ করে এবং তাহাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকে লুকাইয়া রাখার একটি ছদ্ম আবরণ খুঁজিয়া পায়। অবস্থা দর্শনে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, ঢাকায় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবামাত্রই তাহাদের ষড়যন্ত্র কার্য্যকরী করার চেষ্টা চলিতেছিল। এই সংবাদ পাইয়া সরকার শান্তিরক্ষার জন্য সতর্ককতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী করেন।

ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত তথ্য

যাহারা সরকারের পতন ঘটাইবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল সরকারের এই আদেশকে তাহারা বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জনপ্রিয় দাবীর কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টা বলিয়া প্রচার করে। নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ হইতেই প্রমাণিত হইবে যে, তাহাদের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবার এবং সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার যে ষড়যন্ত্র কার্য্যকরী করার জন্য তাহারা দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিল, তৎপ্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের উদ্দেশ্যেই এই অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারীর একপক্ষ কালেরও কম সময় পূর্বে ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে ঢাকায় এবং প্রদেশের অন্যান্য স্থানে সভা শোভাযাত্রা প্রভৃতির আয়োজন করা হয় এবং তখন এ ব্যাপারে কোনখানেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না। ১৪৪ ধারা জারী করিয়া এরূপ সভা বা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধও করা হয় নাই। ইচ্ছা করিলে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি লইয়া সভা শোভাযাত্রা করা

www.pathagar.com

যাইত। কিন্তু কখনও সেরূপ অনুমতি চাওয়া হয় নাই। উপরন্তু বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করিয়া ব্যবস্থা পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হইবার পরও অরাজকতা সৃষ্টির উদ্যোক্তারা তাহাদের কার্যকলাপ হইতে বিরত হয় নাই। বস্তুতঃ তাহারা দ্বিগুণ শক্তি লইয়া তাহাদের উদ্দেশ্যের পথে অগ্রসর হইতেছিল। এইভাবে একথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি ষড়যন্ত্রকারীদের হীন উদ্দেশ্যের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের একটি পন্থা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

১৪৪ ধারা জারীর কারণ

একথাও প্রচার করা হয় যে, ১৪৪ ধারা জারী করিয়া বাংলা ভাষার স্বপক্ষে জনসাধারণের আন্দোলনের স্বাধীনতার উপর যে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল তাহার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ স্বরূপই ২১শে ফেব্রুয়ারীর গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। একথাও যে মিথ্যা, নিম্নলিখিত তথ্যাদি হইতেই তাহা প্রমাণিত হইবে। ১৪৪ ধারা জারী করা হয় ২০শে ফেব্রুয়ারী বৈকালে। পরের দিন সকালে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির এবং বলপূর্বক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার এক ব্যাপক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পূর্ব হইতে প্রস্তুতির যে সংবাদ সরকার পাইয়াছিলেন, তাহা ছাড়াও ষড়যন্ত্রের ধরন হইতেই প্রমাণিত হয় যে, রাতারাতি ইহা কার্যে পরিণত করা সম্ভবপর ছিল না।

২১শে ফেব্রুয়ারী সকালে একদল ছাত্র ও জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তোলা হয় এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের নিকটবর্ত্তী স্থানে পুলিশের সহিত এক গুরুতর সংঘর্ষে তাহাদিগকে লিপ্ত করা হয়। এই সময় ৩ ব্যক্তি নিহত হয়, তাহাদের মধ্যে মাত্র ১ জন ছিল ছাত্র। নিহতদের মধ্যে ২ জন ছাত্র ছিল বলিয়া ইতিপূর্ব্বে সরকারের নিকট যে খবর দেওয়া হইয়াছিল তাহা সত্য নহে।

ইহার পর চোখের নিমেষে হতাহতের সংখ্যা সম্পর্কে শহরময় নানারূপ মিথ্যা গুজব ছড়াইয়া পড়ে। নিহত ও আহতদের সংখ্যা অত্যধিক বাড়াইয়া বলা হয়। পরবর্ত্তী দিনের মধ্যেই ইহার প্রতিশোধ দাবী করিয়া লাল কালিতে সুপরিচিত কম্যুনিষ্ট কায়দায় লিখিত ধ্বংসাত্মক প্রচারপত্র ও অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ দেওয়াল-লিপি শহর ছাইয়া ফেলে। সংবাদপত্রে এক বিবৃতি মারফৎ আওয়ামী লীগ নেতা ভাসানীর মওলানা নিহতের সংখ্যা ১৭ জন বলিয়া উল্লেখ করেন। ময়মনসিংহে ও প্রদেশের অন্যান্য স্থানে প্রচারিত দেওয়াল-লিপিতে ১১ জন বালিকাসহ ১৬৫ সন নিহত বলিয়া প্রচার করা হয়। এই সকল প্রচারপত্রের অনেকগুলিই ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখেই সন্দ্বীপের ন্যায় নিভৃত ও দুর্গম স্থানেও প্রচারিত হইতে দেখা যায়। ইহা

www.pathagar.com

হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে এই প্রচারপত্রগুলি রাতারাতি অথবা ১৪৪ ধারা জারীর পরে মুদ্রিত হয় নাই।

ভীতি প্রদর্শন

২১শে ফেব্রুয়ারী গুলী চালনার পর মুহূর্তেই সরকারকে নিন্দা করার কাজে সংবাদপত্রের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকার প্রত্যেকটি সংবাদপত্রকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। সংবাদপত্রগুলি যাহাতে ভীতি প্রদর্শনকে ফাঁকা আওয়াজ বলিয়া মনে করিতে না পারে তজ্জন্য অন্যান্য সংবাদপত্রকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পরের দিন "মর্ণিং নিউজ" পত্রিকার ছাপাখানায় আগুন লাগাইয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়।

একই সময়ে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণকে মুসলিম লীগ দল হইতে ইস্তাফাদানে বাধ্য করার জন্য তাঁহাদের প্রতিও ব্যক্তিগত আঘাতের হুমকি দেওয়া হয়। শাসনব্যবস্থা বানচাল করিয়া দেওয়ার জন্য অনেক সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করা হয় এবং তাঁহাদিগকে কার্য্যে যোগদানে বিরত করার জন্য ভীতি প্রদর্শন করা হয়। তিন দিন যাবৎ অধিকাংশ দোকানপাট ও প্রায় সমস্ত যানবাহনকে অনুরোধ করিয়া অথবা ভয় দেখাইয়া হরতাল পালনে বাধ্য করা হয়। স্থানীয় টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা এবং লোকাল ট্রেন চলাচলও অনুরূপভাবে ব্যাহত করা হয়। পাকিস্তান বেতারের কাজ বন্ধ করারও চেষ্টা করা হয়। এই রূপে আমার সরকারের নিকট এবং প্রত্যেকটি লোকের নিকট একথা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্নটি আসল ব্যাপার নয়।

ষড়যন্ত্রকারীদের আসল উদ্দেশ্য ছিল, ভয় দেখাইয়া এবং দরকার হইলে বলপূর্ব্বক বর্ত্তমান সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং তাহাদের চরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বর্ত্তমান সরকারের স্থলে তাহাদের আজ্ঞাবহ ও ক্রীড়নক একটি সরকারের প্রতিষ্ঠা করা।

ঢাকার গোলযোগ

পরিষদের জানা আছে যে, নারায়ণগঞ্জের এক শোভাযাত্রায় বিক্ষোভকারীদের অনেকে "জয় হিন্দ" ও "যুক্ত বাংলা চাই" ধ্বনি করিয়াছে। পাকিস্তানের দুষমনরা দেশবিভাগের পর সর্ব্বপ্রথম আকস্মিকভাবে এরূপ কার্য্য করার সাহস সঞ্চয় করিয়াছে ইহা বিশেষ অর্থপূর্ণ। তাহাদের অন্যান্য পরিকল্পনার সহিত ইহার সামঞ্জস্য আছে।

www.pathagar.com

এই অবস্থায় সরকার উপলব্ধি করেন যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে বিঘ্ন উৎপাদনকারী এই আন্দোলনকে কঠিন হস্তে দমন করার সময় আসিয়াছে। এই সম্পর্কে একাগ্রমনে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সরকার পরিষদে অধিবেশন স্থগিত রাখেন।

এই সম্পর্কে সরকার ষড়যন্ত্রের সহিত লিপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বাহিরের কতিপয় পাণ্ডাকে ঢাকায় গ্রেফতার করেন।

ইহাদের মধ্যে এই পরিষদের সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন ধর, শ্রী গোবিন্দলাল বানার্জ্জি, শ্রী সতীন সেন, জনাব খয়রাত হোসেন এবং জনাব আবদুর রশিদ তর্কবাগীশও আছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে অক্ষম হন এবং ছাত্রগণ ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে আইন অমান্য করতঃ মাইক্রোফোনের সাহায্যে বক্তৃতা করিয়া শক্তি প্রয়োগের প্ররোচনা দিতে থাকে। এই সময়ে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাইক্রোফোনগুলি হস্তগত করে।

এই অরাজকতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হিসাবে পুলিশ অতঃপর সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলে খানাতল্লাসী করে। উক্ত স্থান হইতেই এই সমস্ত আইনবিরোধী আন্দোলন পরিচালিত হইতেছিল এবং এই খানাতল্লাসীর সময় এখান হইতে বহু সংখ্যক ধ্বংসাত্মক প্রচারপত্র ও একটি লাইসেন্সবিহীন বন্দুক উদ্ধার করা হয়। উক্ত প্রচারপত্রগুলি অবশ্যই বহুদিন ধরিয়া মুদ্রিত ও সংগৃহীত হইয়াছিল।

পরিস্থিতির উন্নতি

২৪শে ফেব্রুয়ারী সরকার এই অরাজকতার বিরুদ্ধে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন এবং জেলা কর্তৃপক্ষ, সৈন্য বাহিনী ও পুলিশের কার্য্যকুশলতা ও ধৈর্য্যের গুণে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ ব্যতীত ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই ঢাকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে।

সরকার যেরূপ সুকৌশলে এই নাজুক এবং উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়া দেশে শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। পরিষদ নিশ্চয় ইহার মূল্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

www.pathagar.com

কোন প্রকার বলপ্রয়োগ না করিয়া অবস্থা আয়ত্তে আনার প্রশংসা পুলিশ এবং সেনাবাহিনীরই প্রাপ্য, কারণ এই গুরুদায়িত্বের ভার তাহাদের উপরই দেওয়া হইয়াছিল।

ঢাকার বাহিরে গোলযোগ

ঢাকার বাহিরে অরাজকতা কেবলমাত্র নারায়ণগঞ্জের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেখানে পুলিশ দলকে আক্রমণ করিয়া স্কুলের তহবিল তসরূপের দায়ে ধৃত জনৈকা শিক্ষয়িত্রীকে উদ্ধারের জন্য একদল দুষ্কৃতকারিকে প্ররোচিত করা হয়।

উপরোক্ত গোলযোগ সৃষ্টিকারীগণ জনতাকে বুঝায় যে, উক্ত শিক্ষয়িত্রীকে সাধারণের তহবিল তসরূপের জন্য গ্রেফতার করা হয় নাই, তাহাকে বাংলা ভাষার স্বপক্ষে আন্দোলন করার জন্যই গ্রেফতার করা হইয়াছে। এই সমস্ত গোলযোগ সৃষ্টির জন্য কিরূপ জঘন্য পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়। এই সম্পর্কে পরিষদের সদস্য জনাব ওসমান আলীকে গ্রেফতার করিতে হয়। তাঁহার বাড়ীই এই সমস্ত অরাজকতার কেন্দ্রস্থল ছিল। জনাব ওসমান আলীর বাড়ী হইতে বহু ধ্বংসাত্মক প্রচারপত্র পাওয়া যায়।

ঘটনাস্থলে মুসলমানের পোষাক পরিহিত কয়েকজন হিন্দু যুবককেও গ্রেফতার করা হয়। অল্পকাল পূর্বেই এই সমস্ত যুবক এই প্রদেশে আগমন করে।

অনুরূপ ছদ্মবেশী বিদেশীরা সুদূর চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতেও গ্রেফতার হইয়াছে।

সৌভাগ্যের বিষয় প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলে এই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হওয়ার পূর্বেই সরকার ষড়ন্ত্রের সহিত জড়িত পাণ্ডাদের ঢাকায় গ্রেফতার করিয়া সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই জন্য এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের সতর্কতার ফলে জেলা অঞ্চলে আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইতে পারে নাই।

অবশ্য কোন কোন অঞ্চলে ট্রেন চলাচলের বিঘ্ন ও বিলম্ব সৃষ্টির অপচেষ্টাও হইয়াছিল। অন্যান্য কতকগুলি অঞ্চলে জনসভা করিয়া উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতাদি দেওয়া হইয়াছিল।

ধ্বংসাত্মক প্রচারপত্র

ঢাকার মতো প্রদেশের অনেকগুলি শহরে ধ্বংসাত্মক প্রচার-পত্রও বিলি করা হইয়াছিল। এই প্রচার-পত্রগুলিতে ঢাকার ঘটনা সম্পর্কে নির্জ্জলা মিথ্যা ও চরম

www.pathagar.com

উত্তেজনাপূর্ণ বিবরণ ছাপা হইয়াছিল। বরিশাল ও অন্যান্য কতকগুলি শহরে প্রাপ্ত অনুরূপ একটি প্রচার-পত্রে বলা হইয়াছে, ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় গুলিবর্ষণের সময় পুলিশ ষ্টেনগান ব্যবহার করিয়াছিল এবং ৫০ জন ছাত্রকে হত্যা করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র ৩ ব্যক্তি নিহত হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে ১ জন মাত্র ছাত্র এবং কোন ষ্টেনগান ব্যবহার করা হয় নাই। বলা হইয়াছে যে, ২২শে ফেব্রুয়ারী লরী বোঝাই সৈন্যদল ষ্টেনগানের গুলিবর্ষণ করিতে করিতে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। প্রকৃতপক্ষে সৈন্যরা একেবারেই গুলিবর্ষণ করে নাই অথবা কোন ব্যক্তির প্রতি কোনরূপ বলপ্রয়োগ করে নাই। উক্ত প্রচার-পত্রে পরিষদ সদস্যগণকে "পূর্ববঙ্গের দালাল এম, এল, এ,-র দল বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং প্রদেশবাসীকে বিদ্রোহ ঘোষণা এবং তথা-কথিত ঢাকার 'বিপ্লবে' যোগদানের আহ্বান জানানো হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, ঢাকার রাজপথ শহীদের রক্তে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। প্রচার-পত্রের পরিশিষ্টাংশে বলা হইয়াছে যে, এই প্রচার-পত্রের প্রণেতারা "খুনের বদলে খুন" নেওয়ার শপথ গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহারা বিপ্লবের কোদালে সরকারের কবর খনন করিবে। এই সব প্রচার-পত্র দেশের বহিরাঞ্চল হইতে আমদানী করা হইয়াছে। আমার সরকারের পক্ষে উহা বিশ্বাস করার কারণ রহিয়াছে।

নির্জ্জলা মিথ্যা গুজব

অনুরূপ ভাবে বিভিন্ন জেলায় বহু নির্জ্জলা মিথ্যা গুজব ছড়ানো হয়। বলা হয় যে সরকারের অবস্থা কাহিল অথবা সরকারের পতন ঘটিয়াছে ; ময়মনসিংহে আমার বাড়ী পুড়াইয়া ভস্মীভূত করা হইয়াছে ; সরকারের নির্দ্দেশ পালন করিবে না বলিয়া সন্দেহে এক ইউনিট বাঙালী পুলিশকে নিরস্ত্রীকৃত করা হইয়াছে ; ঢাকায় শত শত লোককে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে ; পুলিশ ও সৈন্যরা রাস্তা হইতে লরী বোঝাই করিয়া লাশ তুলিয়া লইয়া গিয়াছে এবং পুড়াইয়া ফেলিয়াছে ; যে সব ছাত্র মারা গিয়াছে, গোপনে তাহাদের লাশ দাফন করা হইয়াছে এবং তাহাদের কোন জানাজা হয় নাই ; অনুরূপ আরও বহু কথা। এই সব গুজবের প্রত্যেকটাই সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে ২১শে ফেব্রুয়ারীর গুলিবর্ষণের ফলে ১ জন ছাত্রসহ মোট ৩ জন মারা যায় এবং পরদিনের গুলিবর্ষণের ফলে ১ ব্যক্তি মারা যায়। তদুপরি ২২শে ফেব্রুয়ারী মটর দুর্ঘটনায় আরও ২ ব্যক্তি মারা যায়, এই দুর্ঘটনার সহিত ঢাকার গোলযোগের কোন সম্পর্ক নাই। এই ৬টি লাশ দাফনের পূর্বে হাফিজ আবদুল গফুর সাহেব জানাজা পাঠ করেন। নিহত ছাত্রের আত্মীয়-স্বজন এবং অন্যান্য নিহত ব্যক্তিদের

www.pathagar.com

যেসব আত্মীস্বজনকে পাওয়া গিয়াছিল তাহারা সকলেই জানাজায় সামিল হয়। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব ইউসুফ এবং জনাব ওবায়দউল্লার তত্ত্বাবধানে জানাজা হয়।

কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূমিকা

দেশে অরাজকতা সৃষ্টির অসদুদ্দেশ্যে সুপরিচিত কম্যুনিষ্টদের অনুসৃত পন্থায় জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক ও উদ্বেগ সৃষ্টি এবং জনসাধারণকে হিংসাত্মক কার্য্যে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে যে ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল এ সবকিছু অবশ্যই তাহারই অংশবিশেষ। সরকারকে উৎখাত করার জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টি যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল সে সম্পর্কে আমি কলিকাতার দৈনিক "স্বাধীনতা" পত্রিকার মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি। কম্যুনিষ্ট পার্টির এই মুখপত্রটির নিজ প্রতিনিধি প্রেরিত ১০ই ও ১১ই মার্চ্চের দুইটি প্রবন্ধে পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টি অতীতে কিভাবে বিভিন্ন ঘটনাকে কাজে লাগাইয়াছে, তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। ঢাকার সাম্প্রতিক দুর্ঘটনা সম্পর্কে উক্ত প্রবন্ধে বলা হইয়াছে ঃ

"পূর্ব্ববঙ্গের কম্যুনিষ্ট পার্টি ভাষা আন্দোলনকে প্রথম থেকে সঠিক পথে চালনা করতে সাহায্য করে। প্রত্যেক জেলাতে কম্যুনিষ্ট পার্টি ভাষা আন্দোলনের সর্বদলীয় কমিটি গঠনে উদ্যোগী হয়, ভাষা আন্দোলনকে ব্যাপক করে তুলতে চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে তিনটি বিপদ সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রথম থেকেই সতর্ক করে দেয়। হিন্দু-বিরোধী এবং কম্যুনিষ্ট-বিরোধী সরকারী বিভেদ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট পার্টি হুঁশিয়ারী দেয়। আজ যে পূর্ব্ববঙ্গে ভাষা-অন্দোলন নানা চক্রান্ত এড়িয়ে জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে, তার অনেকখানি কৃতিত্ব যে পূর্ব্ববঙ্গের কম্যুনিষ্টদের এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

শত্রুদের চক্রান্ত

পাকিস্তানের সকল দেশপ্রেমিকের ন্যায় ইহা দেখিয়া আমিও দুঃখবোধ করিতেছি যে, রাষ্ট্রের শত্রুরা অল্পক্ষণের জন্যও আমাদের কিছুসংখ্যক ছাত্র ও ঢাকার কিছুসংখ্যক লোককে প্রতারিত করিতে এবং তাদের দ্বারা আইনশৃঙ্খলা নষ্ট করিয়া পাকিস্তানকে বিপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এখানে মুষ্টিমেয় লোক মুসলিম লীগ সরকারকে ভয়প্রদর্শন ও বলপ্রয়োগের দ্বারা অপসারণপূর্ব্বক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। সে সুযোগ দিলে সরকারের জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাঘাতকতা করা ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন হইত। ইহাতে গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করা হইত।

www.pathagar.com

আমি ও আমার সহকর্ম্মিগণ রাষ্ট্রের এইরূপ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা বিশৃঙ্খলা দমনে ব্যর্থ হইলে আমাদিগকে দেশবাসী ও দেশের ভবিষ্যত নাগরিকদের নিকট রাষ্ট্র ও জনসাধারণের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য পালনে শোচনীয় ব্যর্থতার অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইতে হইত।

সরকারের সহিত জনাসধারণের সহযোগিতা

আমাদের জনসাধারণের পক্ষে ইহা কৃতিত্বের কথা যে, গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী এবং ৩রা মার্চ্চ তারিখে আমার বেতার বক্তৃতায় আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পর জনসাধারণ ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পাকিস্তানের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সর্ব্বত্রই সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে থাকেন।

আমার প্রশংসা এবং গর্বের বিষয় এই যে, বিদেশী এজেন্টগণ ভাষা আন্দোলনকে কাজে লাগাইতেছে, জনসাধারণ একথা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। ইহাতে রাষ্ট্রের শত্রুগণ অবশ্যই দমিত ও আশাহত হইয়া পড়ে।

আমাদের জনগণের দৃঢ়চিত্ততা ইহার দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে এবং আরও পরিস্ফুট হইয়াছে যে, যে কোন মহলের যে কোন ভাবের হউক না কেন, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার উপর আঘাত জনসাধারণ কখনই বরদাশ্‌ত করিবে না। প্রদেশবাসীর এই সাড়া ও সহযোগিতা না পাইলে আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গে সচেষ্ট দুষ্কৃতাকারীদের দমন করা সরকারের পক্ষে শক্ত হইত।

সরকারী ব্যবস্থা

বলপূর্ব্বক সরকার উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রকারীদের দমনের ব্যবস্থা করিয়া সরকার প্রদেশকে দুর্যোগ ও বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সত্যই আমরা গণতন্ত্রকে সর্ব্বাধিক গুরুতর সঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়া পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিয়াছি। কিন্তু এই কার্য্যের জন্য সর্ব্বাধিক কৃতিত্ব প্রদেশবাসীরই প্রাপ্য।

শত্রুদের সম্পর্কে হুঁশিয়ারী

প্রদেশের শান্তি আশু বিপদ হইতে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের আজাদীর বিপদ এখনও সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী কিছু সংখ্যক লোক এখনও রহিয়াছে। উহাদের দ্বারা অনুরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।

www.pathagar.com

পাকিস্তানকে দুর্ব্বল করার উদ্দেশ্যে উহারা সন্ত্রাসমূলক কার্য্যের দ্বারা আমাদের জনগণের মধ্যে যে পুনরায় আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করিতে পারে এরূপ আভাসও পাওয়া গিয়াছে। নারায়ণগঞ্জে গোলযোগ দমন ও উহার পাণ্ডাদের গ্রেফতারের পর অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের হস্তে একজন কনষ্টেবল নিহত এবং একজন আনসার আহত হয়। অতঃপর ঢাকা শহরের একটি গৃহে হঠাৎ একটি দেশী বোমা বিস্ফোরণ হয়। আজাদীর শত্রুরা জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি অথবা পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত করার উদ্দেশ্যে ভিন্ন পন্থাও গ্রহণ করিতে পারে।

ঢাকার সাম্প্রতিক গোলযোগ হইতে আমাদের এই একটি মাত্র শিক্ষাই গ্রহণ করিতে হইবে যে, আমাদের আত্মতুষ্ট হইলে চলিবে না। আর এই শিক্ষা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে।

স্বাধীনতা কষ্টার্জ্জিত। শত সহস্র জীবন ও লক্ষ লক্ষ গৃহের বিনিময়ে পাকিস্তান অর্জ্জিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত কষ্টার্জ্জিত স্বাধীনতা রক্ষার কাজ অধিকতর কঠিন। উহার জন্য আমাদের অনুক্ষণ সজাগ ও সর্ব্বদা তৎপর থাকিতে হইবে।

EBGD-52/53-801 (Spl)—175M

www.pathagar.com

ভাষা-আন্দোলনের অলিখিত অধ্যায় ঃ ফকির মহিন শাহের ভাষ্য

[ভাষা-আন্দোলনে তাঁর সম্পৃক্ততা-বিষয়ে বাউলসাধক ফকির মহিন শাহের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি দুই দিনে। ১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসের ৯ ও ১৫ তারিখের আলাপচারিতার ভিত্তিতে বর্তমান রচনাটি প্রস্তুত করা হয়। — আবুল আহসান চৌধুরী]

দেহ-খাঁচায় অচিন পাখির আওনা-যাওনার সন্ধান আর আরশিনগরের পড়শির খবর করাই আউল-বাউলের সাধনার কাজ। বাউলের গান তাই দেহ-জরিপের গান, মানব-জমিন আবাদের গান, 'গভীর নির্জন পথে' মনের মানুষকে খুঁজে ফেরার গান। এই নিরিখে বিচার করলে আত্মমুখীন বাউল-ফকিরের সাধনা ও তত্ত্বকে আপাত দৃষ্টিতে জীবন ও সমাজ-বিচ্ছিন্ন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই অবজ্ঞাত মরমীসাধকের দল যে নিছক পলায়নবাদী অধ্যাত্ম-বিবরবাসী নন, তাঁরাও যে সামাজিক দায় বহন করেন, সমকালীন ঘটনায় আলোড়িত হন, সমাজ-সংলগ্ন চিন্তায় সমর্পিত সেই দৃষ্টান্ত বিরল কিন্তু দুর্লভ নয়। বাউলসাধনার মহত্তম পুরুষ লালন সাঁইয়ের গানে সমাজচেতনার গভীর পরিচয় প্রতিফলিত। কেবল সঙ্গীতে নয়, সামাজিক জীবনেও তাঁর সচেতন প্রতিবাদী ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রজাদরদী সুহৃদ্ কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের বিরুদ্ধে সামন্ত-প্রভুর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিতে বাউল-বাহিনী নিয়ে লালন বিপন্ন বন্ধুর সাহসী সহায় হন। লালন-শিষ্য দুদ্দু শাহের গানে তত্ত্ব ছাপিয়ে সমাজ-বাস্তবতা এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে। এই ধারায় আরো একজন বাউলের নাম করতে হয়, তিনি লালন-ঘরের চতুর্থ সিঁড়ির সাধক ফকির মহিন শাহ (১৩১০—১৪০৩)।

সমকালীন বাউলকবিদের মধ্যে মহিন শাহ বিশেষ 'মান্যমান'। মহিন শাহের জন্ম বৃহত্তর ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত হরিরামপুর থানার হরিহরদিয়া গ্রামে বাংলা ১৩১০ সালের আশ্বিন মাসে। তাঁর পিতা মঙ্গল শাহও ছিলেন দীক্ষিত ফকির। তিনি ছিলেন লালন-শিষ্য দুদ্দু শাহের ভক্ত। অনেকটা উত্তরাধিকার-সূত্রেই বাউলতন্ত্রের প্রতি কৃষিজীবী পরিবারের সন্তান মহিন শাহের অনুরাগ জন্মায়। লালন-শিষ্য মনিরুদ্দীন শাহের একান্ত ভক্ত মঙ্গল শাহ ফকির তাঁর 'চক্ষুদানি'র গুরু। তবে, তারও আগে দীক্ষা নেন ঝিটকার হজরত কাওসার আলী শাহ আল্-চিশ্‌তির কাছে।

www.pathagar.com

মহিন শাহের জীবন বৈচিত্র্যময়। দারিদ্রের কারণে আর আগ্রহের অভাবে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষা হয়নি। তাঁর ভাষায়, 'বিদ্যের দোড় চার কেলাশ মাত্তর'। ছেলেবেলা থেকেই ভবঘুরে জীবনের হাতেখড়ি। বিষয়কাজে কখনোই মন বসেনি। স্বল্প কিছুদিন কৃষিকর্ম করেছিলেন। বয়স যখন বছর কুড়ি, ফরিদপুরে এক অনুষ্ঠানে কবি জসীমউদ্‌দীনের মাধ্যমে কবি নজরুলের সঙ্গে পরিচয় হয়। নজরুল তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ধর্মতলায় এক চায়ের দোকানে কাজে লাগিয়ে দেন। কয়েকমাস পর সেখান থেকে পালিয়ে হাওলা হন খিদিরপুর ডকে। তারপর স্কটল্যাণ্ডের পতাকাবাহী 'Sky' নামের এক জাহাজে সুকানির কাজ নিয়ে চার বছর পৃথিবীর নানা দেশের বন্দর থেকে বন্দরে ঘোরেন। দেশে ফিরে এসে বাবা-মায়ের চাপে সংসারী হতে হয়। ১৩৩৬ সালে শিলেকোটা গ্রামের সূর্যবানুর সঙ্গে ঘর বাঁধেন। প্রথমার মৃত্যুর দুবছর পর ১৩৫১ সালে সাধনসঙ্গিনী হিসেবে তাঁর জীবনে আসে কলাকোপা গ্রামের জোছনা বেগম। কীর্তিনাশা পদ্মায় বাড়িঘর ভেঙে গেলে ফরিদপুরে এসে বসতি স্থাপন করেন। এখানে ১৩৬৭ সালে সেবাদাসী দেহ রাখলে মহিন শাহ গৃহের বন্ধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করে পথে নামেন। প্রথমে যশোরের ত্রিবেণীতে শ্রীকান্ত ক্ষ্যাপার আখড়ায় কিছুকাল কাটে, তারপর সেখান থেকে তেলটুপি গ্রামে। দু-দশক পরে আবার আশ্রয় পাল্টালেন, ফকিরের ঘর হলো কুষ্টিয়ার হালসার কাছে নান্দিয়া-হাড়ুলিয়ায়। পথিক-বাউল শেষ পর্যন্ত এখানেই 'থিতু' হন। তিনি দেহত্যাগ করেন ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, ফরিদপুরে। এই সাধককবির শেষ-শয্যা রচিত হয় ছেঁউড়িয়ায় লালন সাঁইয়ের ধামে।

মহিন শাহ একজন তত্ত্বজ্ঞ সাধক, বিশিষ্ট বাউলপদকর্তা ও নামী গায়ক। আজকের দিনের বাউল-ফকিরদের মধ্যে এই তিনগুণের একত্র সমাহার প্রায় দুর্লভ। ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী নানা অঞ্চলে এই সম্মানিত প্রবীণ সাধুর ভক্ত-শিষ্যের সংখ্যা পাঁচশো ঘরের ওপরে। মহিন শাহের গানের গুরু ফরিদপুরের ফকির মেহেরচাঁন শাহ ও ফকির কছিম শাহ। এঁরা দু-জন ছিলেন বাউলগানের ভাণ্ডারি। কবি জসীমউদ্‌দীনের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসে মহিন শাহ গান রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। কবির প্রেরণায় রচনা করেন ধুয়া-জারি, সারি, পল্লীগীতিসহ আরো অনেক কবিতা ও গান। ভাবসঙ্গীত রচনার প্রেরণা পান সঙ্গীতগুরু ফকির কছিম শাহের কাছে। মহিন শাহ স্বভাবকবি। মুখে মুখে পদ রচনা করতে তাঁর জুড়ি নেই। সবমিলিয়ে তাঁর গানের সংখ্যা প্রায় হাজারের কাছাকাছি। নানা বিষয়ে গান বেঁধেছেন। তারমধ্যে বাউলাঙ্গের সাধন-পদই প্রধান। তাঁর গান সাধুগুরু ও রসিক শ্রোতার কাছে

www.pathagar.com

অত্যন্ত প্রিয় ও পরিচিত। মহিন শাহের পোশাকী নাম মহিউদ্দীন আহমেদ। তবে তিনি মহিন রাজা, মন-মহিন, মহির বাঙাল, মহিম শাহ এইসব নানা নামে পরিচিত। গানের ভণিতাতেও ঘুরে-ফিরে এইসব নাম ব্যবহার করেছেন।

সমকালীন ঘটনা মহিন শাহকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে। তাঁর সাধকসত্তার অন্তরালে যে দেশকালসংলগ্ন সমাজ-সচেতন একটি মন প্রচ্ছন্ন তাঁর অনেক গানেই সেই আভাস মেলে। স্বদেশ ও সমাজের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ একজন সাধক-কবির এ-এক ব্যতিক্রমী ভিন্ন রূপ।

তখন এদেশে ব্রিটিশের রাজত্ব। বাঙালি যুবা-তরুণের 'মাতৃ-মুক্তি পণে'র কাল। মহিন শাহের বয়স ১৭/১৮। মানিকগঞ্জের নটাখোলার জমিদার তারক রায়ের বাড়িতে শারদোৎসব উপলক্ষে থিয়েটার, অভিনয়ের কুশীলব কলকাতা থেকে আগত রায়-বাড়ির আত্মীয়-কুটুম্বরা। থিয়েটার শুরুর আগে মহিন শাহ পরিবেশন করেন তাঁর এই গানটি ঃ

জাগোরে জাগো ও বাংলার সন্তান
জাগোরে হায় হায়।
থাকিতে নিজের বাড়ি
হইলাম পরের গোলাম
এ কথা কি মুখে বলা যায়।।

এই গান স্পষ্টতই স্বদেশী-প্রভাবের ফসল।

ব্রিটিশ যুগে চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান শুনে ও 'স্বদেশী'দের সাহচর্যে এসে মহিন বেশকিছু উদ্দীপনামূলক ধুয়া-জারি রচনা করেন। চল্লিশের দশকের গোড়ায় একবার মানিকগঞ্জের পাটগ্রাম নিয়োগী-বাড়ির বাজারে চারণকবি মুকুন্দ দাসের ভাগিনেয় কালী নট্টের স্বদেশীযাত্রার আসর বসে। সেই পালার গান শুনে অনুপ্রাণিত মহিন শাহ এই ধুয়া-জারিটি রচনা করেন ঃ

গান্ধীর ইতিহাস শুনে পাই তরাস
ফুলশয্যায় হয় যেন গান্ধীর স্বর্গে বাস।।
বহুদিনের আগের কথা তাই করি প্রকাশ
স্বদেশী নেতা ছিলেন ক্ষুদিরাম দাস, মরি হায়রে
সে বোমা বানায়ে হলো দোষী

www.pathagar.com

ব্রিটিশ আইনে হয়ে গেল তাঁহার ফাঁস।।
মহম্মদ আলী দুনিয়া ছেড়ে ভেস্তে করলেন বাস
শওকত আলীর নাই শান্তি-বিলাস, মরি হায়রে
সার আশুতোষ আর সুভাষ বোস
পরলোকগমন করলেন সি. আর. দাস।।

'মানুষ সত্যে'র উপাসক জাত-ধর্মনির্বিশেষে সর্বমানব-মিলনপ্রয়াসী বাউল মহিন শাহ্ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময়ে সম্প্রদায়-সম্প্রীতির গান বেঁধেছেন। চারণের মতো গ্রামে গ্রামে সেই গান গেয়ে ফিরেছেন। মানুষের বাসযোগ্য ভূমি-রচনার জন্য পূর্বসূরী লালনের মতোই জাত-ধর্মের বিভক্তিকে অগ্রাহ্য করে তাঁর সারিন্দায় 'আলেপ মোল্লা' আর 'নরেন ঘোষে'র মিলনের সুর তুলেছেন।

ব্রিটিশ-যুগ শেষ হলো, এলো পাকিস্তানের কাল। এলো স্বপ্ন-সৃজন ও স্বপ্ন-ভঙ্গের কাল। শোষণ-বঞ্চনা আর জাতিগত নিপীড়নের নিগড়ে বাঁধা হলো বাঙালিজাতির ভাগ্য। মিলিয়ে গেলো আশা-জাগানিয়া মিথ্যা মরীচিকা। বাউলের একতারায় জাগলো ক্ষোভ আর বেদনার যুগল-সুরের মূর্চ্ছনা। দেশ-ভাগের পরপরই মন-মহিনের সাহসী কণ্ঠে ধ্বনিত হলো ঃ

পাকিস্তান না পাপীস্থান ভাই বুঝতে পারিনা
কইতে গেলে মনের কথা প্রাণে বাঁচিনা।।

এই গান রচনার জন্য তাঁকে লাঞ্ছনা-নিগ্রহও সইতে হয়।

উনসত্তুরের গণ-অভ্যুত্থানের পর অনিবার্য নিয়মে এলো একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধ। আবেগ-স্পন্দিত অন্তরে সর্বহারা বাউল রচনা করলেন এই গানখানা ঃ

বাংলা মায়ের দামাল ছেলে আয়রে ছুটে আয়রে আয়
মায়ের ভরম রাখিতে মরণ ভালই যদি হয়ে যায়।।

আজিও মরেনি কোনো কাফেরণ
ফেরাউনে নাই হাবিয়া-ভয়
সাদ্দাত-নমরুদ-কারুণের ধন
মৃত্তিকাতে হোক লয়।।

www.pathagar.com

দাকিয়ানুছের দুর্গ ভাঙো
শাণিত কুঠার শাবল-যায়।।
বহু ফাতেমার বুক-জোড়া ধন
মেরেছে এজিদ সামুদ-সেনা
রাজাকার আর আল্‌বদরের
রূপ রয়েছে মোদের চেনা
পুঁজিবাদ আর মজুতদারের
দফা-রফা করবো আয়।।

'স্বাধীনতার জন্মতিথির উদ্বোধনে'র আনন্দ-মুহূর্তে গানের সুরে কথার মালা গেঁথে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের মহিন 'চোখের জলে লয় শরণ'।

ভাষা-আন্দোলন এই বাউলকবির চেতনায় গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। জাতিসত্তার সেই জাগর-মুহূর্তে এই স্ব-শিক্ষিত বাউলও সেদিন কালের বুকে রেখেছিলেন তাঁর দেশপ্রীতি ও ভাষাচেতনার গভীর স্বাক্ষর। সেই কাহিনী গল্পের চেয়েও বিস্ময়কর। সাধককবি মহিন শাহের নিজের জবানীতেই শোনা যাক সেই হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের টুক্‌রো স্মৃতির আলেখ্য ঃ

"১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। আমি তখন ফরিদপুরে। বাড়িঘর সব পদ্মার গর্ভে ঠাঁই নিয়েছে। এর-ওর আশ্রয়ে থাকি, কোনো সাকিন নেই। কখনো ফরিদপুর, আবার কখনো বা লেছড়াগঞ্জে। সাঁইজীর নাম-গান করি আর গ্রামে-গঞ্জে সাধুসঙ্গ করে বেড়াই। সদরপুর থানার ভাবুকদিয়া গ্রামের নোনা কাজীর সঙ্গে এইভাবে আলাপ। নোনা কাজী ঢাকার এক ওয়ার্কশপে কাজ করতেন, থাকতেন সিদ্দিকবাজারে, সাধুগুরুর প্রতি ছিলো একান্ত নিষ্ঠাভক্তি। নোনা কাজী কোনো কাজে সে-সময়ে ফরিদপুরে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে গেলাম ঢাকায় বেড়াতে। যদ্দুর মনে পড়ে ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ কী ৯ তারিখে ঢাকায় পৌঁছে আস্তানা গাড়লাম তাঁর সিদ্দিকবাজারের বাসায়।

ঢাকা তখন বেশ শান্ত-নিরিবিলি শহর। গাড়িঘোড়া বা লোকজনের এতো হৈ-হট্টগোল ছিলোনা। বনের পক্ষির মতো মনের সুখে এদিক-ওদিক ঘুরি। রোজই বিকেলে একবার রমনা পার্কে গিয়ে বসি। একদিন পুকুরের পাড়ে ঘাসের ওপর চুপচাপ বসে আছি। পুকুরে থরে থরে লাল পদ্ম ফুটে আছে, গাছে গাছে পাখি

www.pathagar.com

ডাকছে, বিকেলের ফিঁকে রোদ এসে পড়েছে ঘাসের ওপর, চারদিকে শান্ত-নিথর পরিবেশ। দেল-দরিয়ায় তখন ভাবের জোয়ার জেগেছে। আমি তন্ময় হয়ে আছি। হঠাৎ খেয়াল করলাম আমার পিঠের ওপর তালিমারা জুতোসমেত একখানা পা। চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি কবিভাই, মানে আমাদের কবি জসীমউদ্‌দীন, মিটিমিটি হাসছেন। আমার পাশে বসে পড়লেন। বললেন, "তোর তো কবি কবি ভাব, একেবারে বেহুঁশ হয়ে বসে আছিস্, কিন্তু কবি তো হতে পারলিনে। তা আছিস্ কেমন, কবে এসেছিস?" কুশল জিজ্ঞাসা শেষে এ-কথা ও-কথার পর বললেন, "শোন্, তুই বাংলাভাষা নিয়ে একটা গান বাঁধতে পারবি?" জবাব দিলাম, "চেষ্টা করে দেখতে পারি।" কবি বললেন, "যদি পারিস্ তাহলে পরশুদিন এখানে এই সময়ে আসিস্।" মনে হচ্ছে এটা ঢাকায় আসার দিন তিনেক পরের ঘটনা, সেই হিসেবে তারিখ দাঁড়ায় ১২ই ফেব্রুয়ারি।

এইখানে একটু বলে রাখি, কবি জসীমউদ্‌দীনের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই আমার আলাপ-পরিচয়। গান রচনার প্রেরণাও পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। কবিভাইয়ের সঙ্গে বহু আসরে-বাসরে ঘুরেছি, সুখ-দুঃখের অনেক স্মৃতি জমা হয়ে আছে মনে। কবিভাই ও আমার বাড়ি পদ্মার এপার-ওপার। তিনি ছিলেন মুর্শিদাগানের খুব ভক্ত। নূরুল্লাপুরের সানাল শাহ্ ফকিরের দরবারে মুর্শিদাগানের আকর্ষণে কবি প্রায়ই যেতেন। আমিও তাঁকে প্রায় এক-দেড়শো মুর্শিদাগান সংগ্রহ করে দেই নানা অঞ্চল থেকে। কবির বাইচ খেলার খুব ঝোঁক ছিলো। লেছড়াগঞ্জ বাজারের পাশে ইছামতি নদীতে, নটাখোলার পদ্মার 'মরগাংদী'তে কিংবা দশআনির ধালার পাশে নৌকা বাইচ হতো। কবির লেজুড় হয়ে আমিও যেতাম। ভাঙাগলায় কবি নিজের লেখা বাইচের গান ধরতেন, আমিও গলা মেলাতাম। এখনো মনে পড়ে এই গানটার কথা ঃ

আলেকজান সোয়ারী নাও মন তুমি বাইয়া যাওরে
বাও ধীরে ধীরে তরীখান্ বাওনা ধীরে ধীরেরে।।
ভেল্‌না কাষ্ঠের নৌকাখানি মাঝখানে তার ছৈয়া
আগার থেকে পাছায় যাইতে গলই পড়ে খৈয়ারে।।

কখনো কখনো কবির সঙ্গে গিয়ে বসতাম বাউল-ফকিরের আস্তানায়, রাত কাটাতাম বৈরাগী-বোষ্টমের আখড়ায় বা গান-বাজনার আসর বসতো বেদের বহরে। আজকের ফকিরি গানের নামী গায়ক রজ্জব আলী দেওয়ানও ছিলেন বেদে-সম্প্রদায়ের লোক, তাঁর বহরেও কখনো কখনো আমাদের মজলিশ জমতো। কবির খেয়ালখুশির এইসব কথা বল্‌লে সে তো এক বিরাট কেচ্ছা হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

যা-হোক, কবি ভাইয়ের নির্দেশমতো সিদ্দিকবাজারে নোনা কাজীর বাসায় বসে বেশ কসরৎ করে একখানা গান বাঁধলাম, বাঙলাভাষার গান। দিন দুই পর অর্থাৎ ১৪ই ফেব্রুয়ারি বিকেলে আবার রমনা পার্কে গেলাম। কিছুক্ষণ বাদে কবিসাহেব এলেন। গানটা দেখে খুব খুশি হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, তোর হবে, পরীক্ষায় পাশ করেছিস্। তা তুই গানটা সারিন্দায় তুলে কাল-পরশু আবার একবার এখানে আসিস্ তো।" বেশ ধন্ধে পড়ে গেলাম। ভাবলাম কবির মনে নিশ্চয় কোনো মতলব এসেছে। রাত-ভর কথায় সুর চড়ালাম, পল্লীগানের ঢং-এ বাউলের মেজাজ মিশিয়ে তৈরী করে ফেললাম গানটা। পরের দিনও ঘষা-মাজা চল্লো। ১৬ তারিখে দুপুরে সেবা-শান্তি সেরে সারিন্দাটা কাঁধে ঝুলিয়ে পার্কে উপস্থিত হলাম। গুন্‌গুন্ করে সুর ভাঁজছি, এমন সময় কবিসাহেব এলেন। গানটা শোনালাম তাঁকে। গান শুনে কবি তো আনন্দে আত্মহারা। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বল্লেন, "ওরে চ' চ' দেরী করিস্‌নে আর।" জিজ্ঞেস্ করলাম, "কোথায় যাবো কবিভাই?" তাড়া দিয়ে বল্লেন, "সে পরে শুনবি। এখন ওঠ্। তোকে একটা কাজ দেবো।" হাত ধরে আমাকে একরকম টানতে টান্‌তে রাস্তায় এনে দাঁড় করালেন। একটা খালি ট্যাক্সি থামিয়ে আমাকে নিয়ে উঠলেন তাতে। হাতের ইশারায় ট্যাক্সিঅলাকে পুরনো ঢাকার দিকে যেতে বললেন। ঢাকায় আমি নতুন। এর আগে দু-চারবার এলেও পথ-ঘাট তেমন ভালো চিনিনে। মনে হলো কবিসাহেবের ইঙ্গিতে ট্যাক্সিটা সদরঘাটের মোড়ে এসে থাম্‌লো। একটা ঠেলাগাড়িঅলাকে ডেকে কবিসাহেব তার হাতে কয়েকটা টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, "এই ফকিরকে তুই সন্ধে পর্যন্ত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবি। তোর ঠেলার ওপর বসে ও গান করবে।" মনে হলো ঠেলাঅলা কবিসাহেবকে চেনে; সে বাবরি দুলিয়ে সানন্দে সায় জানালো। কবিসাহেব আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "এই হলো তোর কাজ। যা ঠেলায় ওঠ, গলা ছেড়ে গান ধর্। গান ফুরোবে আবার ধরবি, ফুরোবে আবার ধরবি। এবার দেখবো তোর মুরদ কেমন!" আমাকে ঠেলায় চড়িয়ে দিয়ে কবিসাহেব ট্যাক্সি নিয়ে ভোঁ করে বেরিয়ে গেলেন।

আমি সারিন্দাটা কোলের ওপর নিয়ে বেশ জুত করে বসে ঠেলার সওয়ারি হলাম। চারপাশের কৌতূহলী লোকজন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। আমিও বেশ মজা পেয়ে গেলাম। ঠেলা চল্‌ছে, মোড়ে মোড়ে মাঝে-মধ্যে একটু থাম্‌ছে, আবার চল্‌ছে। আমি সারিন্দা বাজিয়ে নতুন বাঁধা গানখানা গেয়ে চলেছি ঃ

আ-মরি বাংলা ভাষা
মা বোলা ডাক মধুর লাগে।

www.pathagar.com

মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে
মা- মা বোলে পুলক জাগে।।
বাংলা মা-কে ভালবাসি
পল্লীবালার কল-হাসি
মেঠো সুরে বাজে বাঁশি
মুকুল-ঝরা কুসুমবাগে।।
মন পাগল বাউলগানে
সুরের মিলন একতারাতে
ধানের ক্ষেতে খুশির মাতন
শাওন-বাদল-বান ধারাতে।
মা জননী বঙ্গভূমি
তোমার যুগল কলম চুমি
সাত-রাজার ধন মানিক তুমি
পথের ধুলা অমল ফাগে।।

তখন বয়স কম, গলায় বাঘের দাপট। গান শেষ হচ্ছে, ফের-ফিত্তি ঘুরিয়ে ধরছি। মোড়ে মোড়ে লোকজনের ভীড় উঠেছে। সবাই যে খুব উপভোগ করছে, আনন্দ পাচ্ছে, তা বেশ বুঝতে পারছি। স্কুল-কলেজের ছেলেরা তুড়ি মেরে আমাকে সাবাসি দিচ্ছে। নগরে নবীন বাউল আমি, এ-সব দেখে-শুনে আর তারিফ পেয়ে জোশ জেগে উঠলো মনে। এই গানের ফাঁকে ফাঁকে আমি আরেকখানা দেশ-বন্দনার ধুয়োও ধরছিলাম, এই পদটা দেশভাগের পরপরই রচনা করি ঃ

ওগো আমার ভালবাসার সাধের বঙ্গভূমি
শস্য-শ্যামলা সুজলা-সুফলা শান্তিদায়িনী জননী তুমি
তোমার কদম চুমি।
ওগো মাটির জননী আমার
কত শীতল কোল তোমার
ভুলনা সন্তানে মাগো রেখো আপন কোলে।।
সকল দেশের রানী এ যে আমার জন্মস্থান
গাছে গাছে শোভিছে পুষ্প মাঠে মাঠে দুলিছে ধান
ঐ শোনা যায় রাখাল ছেলের করুণ বাঁশির তান
কাস্তে হাতে কৃষক ভায়া লম্বা দাড়ি সুন্নী মিয়া

www.pathagar.com

পল্লীবধূ কলসী কাঁখে ঐ চলেছে জলে।।
ঐ চলেছে কত তরী পদ্মানদীর বুকে
উড়ায়ে বাদাম দাঁড় টনিয়ে চলেছে আপন মনের সুখে
ভাটিয়ালি গান মুখে, এলো পবন জোর বেগে
কলধ্বনি উঠলো জেগে
গানের সুর মিলিয়ে গেলো অনন্ত কল্লোলে।।

মাঝে মাঝে আবার দেশ ও ভাষা নিয়ে তাৎক্ষণিক রচিত দু-চার কলির মুখ-পাঁচালিও গাইছিলাম।

এইভাবে গান চল্‌ছে, ঠেলাও চল্‌ছে। একসময় ঠেলাগড়িটা একটা মোড়ে দাঁড়ালো, পাশেই পুলিশ ফাঁড়ি। পরে জেনেছিলাম এটা ছিলো লালবাগ থানা। রাস্তার পাশেই কয়েকজন পুলিশ দাঁড়িয়ে। আমি গান করছি, তারা আমার গাড়ির কাছে এগিয়ে এলো। একজন পুলিশ আমার কাঁধে ঝোলানো সারিন্দাটা আচমকা টানে ছিঁড়ে নিয়ে ঠেলাগাড়ির ওপরে জোরে কয়েকটা বাড়ি মেরে ভেঙে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেল্‌লো। সাধের সারিন্দার হাল দেখে আমি তো হতভম্ব। এ-ঘোর কাটতে না কাটতেই পুলিশটা তেড়ে এসে মেজাজ চড়িয়ে আমাকে বল্‌লো, "এই শালা, এই চাক্‌রি তোর কোন্ বাবা দিয়েছে?" আচমকা এই ঘটনা সব এলোমোলো করে দিলো। পেছন থেকে আরেকজন মোটা পুলিশ চেঁচিয়ে বল্‌লো, "শালাকে নামিয়ে আন্।" এ-কথা বলামাত্রই জাহান্নামের পাহারাদারের মতো চেহারার এক পুলিশ আমার চুল ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো, আমি ঠেলার ওপর থেকে হুড়মুড় করে রাস্তায় পড়ে গেলাম। এরপর দু'জন পুলিশ আমার ঘাড়ে ধাক্কা দিতে দিতে ফাঁড়ির দিকে নিয়ে চল্‌লো। ঘরের ভেতরে কয়েকজন দারোগা চেয়ারে বসে আছে। সেপাইরা আমার কী কসুর তা জানালো। এরপর শুরু হলো অকথ্য গালমন্দ। জম্‌কালো গোঁফঅলা একজন দারোগা মুখ খিস্তি করে আমাকে বল্‌লো, "শালা হারামজাদা শুয়োরের বাচ্চা, চারদিকে সব গণ্ডগোল চল্‌ছে, আর শালা ঠেলায় চড়ে রাস্তায় রাস্তায় বাংলাভাষার গান গেয়ে বেড়াচ্ছে!" কথা শেষ হতে না হতেই পেছন থেকে কয়েক ঘা বসিয়ে ছিলো কেউ। আমি কঁকিয়ে উঠলাম। দারোগা সাহেব বললেন, "এ-ই, শালার পোঁদে ভালোমতো বেত কষা দেখি।" হুকুম তামিল হতে বিলম্ব হলোনা। মোটা বেতের পাঁচ-ছটা ঘা পাছায় পড়লো। দারোগা সাহেব চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "শালাকে ছয় শিকে পোর।" ব্যথা আর ভয়ে আমি কেঁদে ফেল্‌লাম। তখন চেয়ার থেকে আরেক দারোগা উঠে এসে আমার পাছায় একটা লাথি মেরে বল্‌লো, "ভাগ্ শালা, আর কোনোদিন যদি দেখি

www.pathagar.com

তবে একেবারে জ্যান্ত পুঁতে ফেল্‌বো।" একটা রামধাক্কা আমাকে রাস্তায় এনে ফেল্‌লো। ধুলো-টুলো ঝেড়ে কোনো-রকম উঠে দাঁড়ালাম। পাশেই ছত্রখান হয়ে পড়ে আছে আমার সাধের সারিন্দা। আমাকে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় যারা গান শুন্‌ছিলো তাদের ভিড় কমেনি। আমার ওপর এই অন্যায় জুলুম হওয়ায় উপস্থিত লোকজন উত্তেজিত হয়ে উঠলো। ভাব-গতিক সুবিধের নয়, আবার কোন্ হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ি এই ভেবে ভিড় ঠেলে জোরকদমে হাঁটা ধরলাম। মনটা বড়ো খারাপ। খুব রাগ হলো কবিভাইয়ের ওপর। তাঁর জন্যেই আজ আমার এই হাল। নতুন কোনো ঝামেলায় আবার যাতে জড়িয়ে না পড়ি তাই ওখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে যাওয়ার জন্য এক রিক্সাঅলাকে বল্‌লাম, "আমাকে রমনায় নিয়ে যেতে পারো? ভাড়া কতো লাগ্‌বে?" রিক্সাঅলা জবাব দিলো, "সে তো অনেকদূর। আপনি সামনে গিয়ে বাস পাবেন, তাতে চলে যান।" আমি তাই করলাম। রমনায় নেমে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে পার্কে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ সেখানে কাটিয়ে নোনা কাজীর বাসায় ফিরে গেলাম। আমার এই দুর্দশার কথা তাদের আর কিছুই জানালাম না। শুধু বল্‌লাম, "সকালে আমাকে গাড়িতে তুলে দেবেন, আমি বাড়ি চলে যাবো।" রাগে-অভিমানে কবিভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের আর ইচ্ছে হলোনা।

পরদিন ১৭ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে নবাবগঞ্জের যন্ত্রাই গ্রামে আমার ফুপুর বাড়িতে আস্‌লাম। রাতটা কাটিয়ে সকালে সেখান থেকে ১২/১৩ মাইল পথ হেঁটে সে-সময়ের মানিকগঞ্জ মহকুমার অধীন হরিরামপুর থানার লেছড়াগঞ্জে এলাম। এই লেছড়াগঞ্জও এখন পদ্মাগর্ভে। ৪/৫ দিন পর জানতে পারলাম ঢাকা শহরে খুব গোলমাল হয়েছে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী-মিছিলে পুলিশের গুলিতে ভার্সিটির অনেক ছাত্র মারা গেছে। আমাদের এলাকাতে এ-খবর পৌঁছনোর পরপরই গঞ্জের দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যায়, স্কুল-কলেজে ধর্মঘট পালিত হয়, মিছিল-মিটিং-এ গ্রাম-গঞ্জ মুখর হয়ে ওঠে। ভাষা-আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে দূর মফস্বলে।

আমার বয়স এখন নব্বই প্রায়। পারের আশায় খেয়াঘাটে বসে আছি, 'কবে সাধুর চরণধূলি মোর লাগবে গায়'। কী জানি কখন সাঁইজীর দয়া হয়। সেদিনের সেই ঘটনা, চল্লিশ বছর পর, আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেদিন ভেবে-চিন্তে আমি এই ভাষার গান করিনি, বা এর গুরুত্বও তখন বুঝিনি। কবিভাইয়ের খেয়ালের খেসারত মেটাতেই এই গানের জন্ম। আজ কবিভাই নেই, কিন্তু আমার মনের পর্দায় তাঁর স্মৃতি একটুও ফিঁকে হয়নি। ফেব্রুয়ারি মাস এলেই এসব কথা মনে পড়ে যায়। এই হলো গিয়ে আমার কাহিনী, মন-মহিনের বাক্য শেষ।"

www.pathagar.com

এরপরেও মহিন শাহ ভাষা-শহীদদের স্মরণে গান বেঁধেছেন। মুক্তিযুদ্ধের গানও রচনা করেছেন। স্বদেশ-সংস্কৃতি, মাটি আর মানুষই তাঁর এ-সব গানের প্রেরণা। ভাষা-আন্দোলনের পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৩ সালের ৫ই মার্চ ঢাকার নবাবগঞ্জে বসে রচিত ভাষার এই গানটি বহু জায়গায় পরিবেশন করেছেন তিনি ঃ

আমার এই মাতৃবুলি
সুর ও ছন্দে বলিহারি
হৃদয়পত্রে সোনার তুলি।।
রূপালি চাঁদের জোছনা নিয়ে
ফুলের পরাগ বিনিয়ে বিনিয়ে
সাম্যরসের সুধা দিয়ে
ভিজিয়ে দেছে পথের ধূলি।।
চপল মেয়ের বাকচাতুরি
কর্ণরন্ধ্রে বেড়ায় ঘুরি
ফুলের তোড়া মারলো ছুঁড়ি
দোল-পূর্ণিমায় আবির গুলি'।।
শিশুমুখে আধফোটা বোল্
বাংলা মায়ের সুমিষ্ট কোল
পূবাল সুরে পরাণ পাগল
মহিন বলে কেমনে ভুলি।।

ঐ ১৯৫৩ সালেরই ১৫ই মার্চ ঢাকার বালিগাঁও-য়ে অবস্থানকালে মাতৃভাষা নিয়ে আরো একখানা গান রচনা করেন। এই গানটিও খুব সমাদর পায়, নানা অনুষ্ঠানে বহুবার গেয়েছেন ঃ

মিষ্টি আমার মায়ের ভাষা
শিখিয়াছি মা'র কোলে বসি
কেমন মধুর কেমন খাসা।।
পায়ে পায়ে আসিয়া হেঁটে
মায়ের চরণ ধরেছি এঁটে
মায়ের বক্ষ-সুধা চেটে চেটে
আমি মিটিয়েছি মন-আশা।।

www.pathagar.com

আমার মাকে আমি ভালবাসি
মা – মা বলে কাঁদি ও হাসি
নয়নজলে সতত ভাসি
মায়ের বুকে না পেলে বাসা।।
জননী মোর বাংলার মাটি
কতই সুন্দর কতই খাঁটি
নব দুর্বাদলে শীতলপাটি
মহির সবার চেয়ে ভালবাসা।।

এরপর সাধনতত্ত্বের গানেই পুরোপুরি নিমগ্ন হয়েছেন। তবে তাঁর অন্তর থেকে ভাষার প্রেম কখনো মুছে যায়নি। বহুকাল পরে ১৯৭৮ সালে ফরিদপুরে আবার একখানা গান বাঁধেন একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে ঃ

কি যাদু এই বাংলা গানে আ-মরি মরি।
ছন্দরসে মধুমাখা মন নিলরে হরি।।
বাজে প্রেমজুড়ি-একতারা
নাচে গায় বাউল-নাড়া
উদারা-মুদারা-তারা
এক সুরে রাখিছে ধরি।।
রাখাল মাঠে বাজায় বাঁশি
নায়ের মাঝি গায় বারমাসি
জল নিতে বৌ ঘাটে আসি'
কলসী-ভরা গেল পাশরি।।
পল্লীগাথা আর গীতিরসে
চঞ্চল শিশু মন হরষে
মায়ের আদুরে কর-পরশে
ফুল-বিছানায় ঘুমায় পড়ি।।

ভাষা-আন্দোলনে শিক্ষিত নগরবাসীর ভূমিকার কথা আমরা জানি, কিন্তু গ্রামীণ মানুষের প্রতিক্রিয়া বা অবদানের বিষয়টি অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। লোকায়ত সমাজের বাউলের একতারাও যে প্রতিবাদী সুরের ঝঙ্কার তুলতে পারে তার উজ্জ্বল উদাহরণ আছে, কিন্তু তা বিবৃত হয়নি কখনো। ফকির মহিন শাহ সেই অলিখিত ইতিহাসেরই এক বিস্মৃত লোক-নায়ক, তাঁকে স্মরণ করি শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায়।

www.pathagar.com